ডুয়ার্স তরাইতেও প্রকৃতির বিরূপতা বাড়ছেই

শুরু হয়েছে নতুন
ক্রাইম থ্রিলার
'শালবনে রক্তের দাগ'

শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক
ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩০ নভেম্বর ২০১৭। ১২ টাকা

শ্রীমতি
ডুয়ার্স ক্লাবের
এক বছর

ayurveda
The Science Of Life

Divyaur®

PHARMAKRAFT®
Crafting Wellness

Launching

Ayurvedic Range of Products

Divyaur® (A Division of PHARMAKRAFT®)

PHARMAKRAFT THERAPEUTICS PVT. LTD.

For Distributorship Please Call : 8697773093 (10.30 am to 6 pm)

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শনি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা।

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

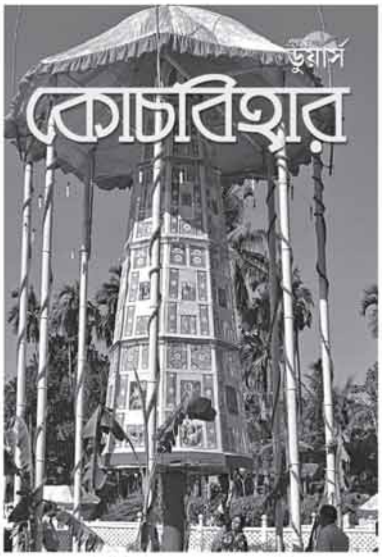

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

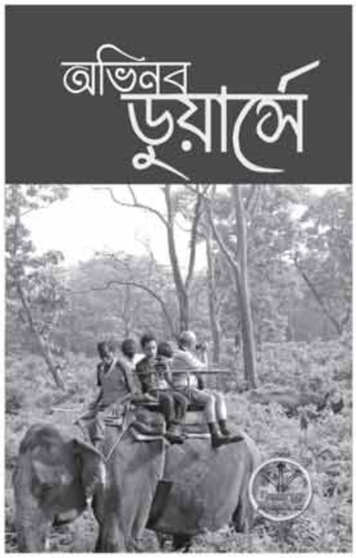

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

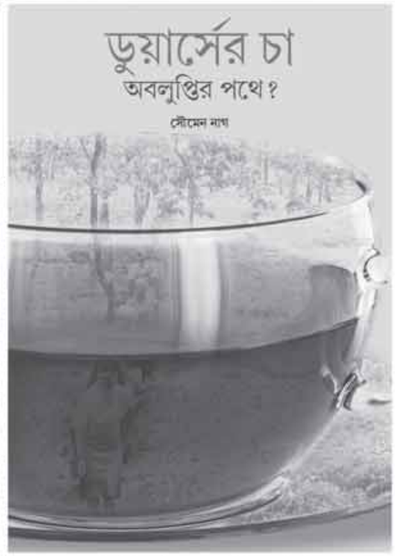

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

ডুয়ার্সের শীত! কামড়ায় না আর

অর্ধনারীশ্বরের মতো ডুয়ার্সে এখন অর্ধশীতেশ্বর। দিনের বেলায় রোদ্দুরের তেজ গায়ে মাখার পর বাপ বাপ বলে ছায়ার পানে ছুটতে ইচ্ছে করছে। দুপুর নাগাদ ফ্যান চালিয়ে শান্ত হচ্ছে জনগণ। কিন্তু বিকেল গড়াল কী গুটি গুটি পায়ে শীতবুড়ি এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া গবেষকেরা এর মধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শীত ক্রমেই বাড়ন্ত হয়ে উঠছে। কার্তিকের ইনিংস শেষ, সদ্য সদ্য ক্রিজে নেমেছে অঘ্রাণ। চিরকাল এই সময়ে ডুয়ার্সে মিঠে-মনোরম আবহাওয়া টের পাওয়া যেত। অথচ এবার হলটা কী? দিনে গরমের ফাস্ট বোলিং আর রাতে শীতমার্কা স্পিনের দাপটে বেচারা অঘ্রাণ থৈ পাচ্ছে না।

কব্জি ডুবিয়ে শীতের সব্জি ভোজনের অপেক্ষায় থাকা গেরস্ত টের পাচ্ছেন আরও এক শীতাভাব। মানে, বাজারের গরম। সকালের দিকে কিঞ্চিৎ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে বটে— কিন্তু বাজারে ঢুকেছেন কী মনে হবে ফায়ারপ্লেসে প্রবেশ করছেন। দোকানিদের মতে, শীতের বদলে গরম পড়লে বাজারের আর দোষ কী? তদুপরি পুজোর আগে যে তুমুল বন্যা হল, সেটাও তো মনে রাখতে হবে! রাজস্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাঁরা নাকি ডুয়ার্সের বর্তমান আবহাওয়ার সঙ্গে সে রাজ্যের খুব মিল পাচ্ছেন।

কিন্তু ডুয়ার্সে অঘ্রাণ মাসের অর্ধশীতেশ্বর দশা নিয়ে মিডিয়ায় হাহাকার শোনা গেলেও এ ঘটনা যে কেবল এই বছরেই ঘটছে, তা ভাবার কোনও কারণ নেই। বস্তুতঃ গত এক-দেড় দশক ধরে এটাই হয়ে উঠছে ডুয়ার্সের বৈশিষ্ট্য। একদা ডুয়ার্সে গরম জামা তোরঙ্গ থেকে বের করা হত কার্তিকের মাঝামাঝি এবং তুলে রাখা হত চৈত্রের শেষে। ডুয়ার্সের চাষি চৈত্র মাসের ঠান্ডায় হালের বলদ বেচে লেপ বানিয়েছিল— এমন কাহিনি শোনা যেত এককালে। আজ যখন সবুজে ঘেরা ডুয়ার্স নিয়ে উচ্ছ্বসিত কবি রোমান্টিক পদ্য লেখেন, তখন তিনি ভুলে যান যে সেই সবুজের বড় অংশ অনেককাল ধরেই ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

নিয়ম মেনে খানিকটা শীত নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু ডুয়ার্স নিয়ে হাজারো উৎসব, মেলা, মোচ্ছব, পর্যটন আর উচ্ছ্বাসের অন্তে মনে রাখা জরুরি যে যতটুকু অরণ্য এখনও ডুয়ার্সে রয়েছে, কেটে ফেলা হয়েছে তার চাইতে বেশি। নভেম্বর থেকে মার্চ-— ডুয়ার্সে পাঁচ মাসের শীতের মরসুম ক্ষয় পেতে পেতে দাঁড়িয়েছে দেড় মাসে। হয়ত গাজলডোবার পর থেকে তিস্তার মত শীতও শুকিয়ে যাবে একদা। তখন জঙ্গলের গভীরে এসি মেশিন লাগিয়ে টাকা লোটার পার্টিকের অভাব হবে না।

চতুর্থ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা,
১৬-৩০ নভেম্বর ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৮

ডুয়ার্স তরাইতেও প্রকৃতির বিরূপতা বাড়ছেই ৪১

উত্তরপক্ষ ৩৮

যে দীপগুলি নিভে গেল

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৩

শালবনে রক্তের দাগ ৩০

তরাই উৎরাই ১৭

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৫

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬

ডুয়ার্সের ডায়েরি ১৩

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪৫

শ্রীমতী ডুয়ার্স

বিশেষ ক্রোড়পত্র ২১

ডুয়ার্সের ডিশ ২৮

সুস্বাস্থের ডুয়ার্স ২৯

প্রচ্ছদ ছবি: সাবিনা সুলতানা,
ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

ছুটবি আর

হুঁ হুঁ বাবা! খাস মুম্বই থেকে লোক এসে বসিয়ে দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে। এবার চালা দিকি কত্ত জোরে চালাবি! এদ্দিন বাইকে বসে ইলেকট্রনের গতিতে ছুটতিস আর পুলিশ ধরলে বলতিস, কই! জোরে তো যাচ্ছিলাম না কাকা! এবার আর ও সব হচ্ছে না। লেজার গান বলে কথা। তেপায়ায় বসিয়ে তাক করে লেজার মারলেই বোঝা যাবে কত স্পিডে ছুটছিস। দরকারে ছোটার ছবি হাতে গরম প্রিন্ট করে ধরিয়ে দেওয়া হবে। এতদিন যে পথের কুকুরকে চমকে, গোমাতাদের ঘাবড়িয়ে, বরাহদের নাচিয়ে, পাব্লিককে খাবি খাইয়ে ঘ্রং ঘ্রং ভটর ভটর রবে বাইক হাঁকিয়েছিস— এবার তার কড়ায় গন্ডায় উশুল হবে, বুঝলি? পাগলাটে গাড়ি চালকদের জন্য গতি মাপার লেজার গান বসেছে কি না জলপাইগুড়ি টাউনে, এবার ছোট দিকি!

হায় অর্বাচীন

কী কান্ড রে মামা! কারা জানি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বরাত নিয়ে বিশ্রামাগার বানাতে গিয়ে স্বয়ং নেতাজীকে উচ্ছেদ করতে গিয়েছিল! তা বিশ্রামাগার বানাবি ভালো কথা। কিন্তু তা করতে গিয়ে এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা নেতাজীর স্ট্যাচুটাকে ভেঙে ফেলবি বলে ফন্দি আঁটলি বসে বসে? আরেকটু হলে তো দিয়েই দিয়েছিলি হাতুড়ির ঘা। বদ মতলব টের পেয়ে এলাকার লোক তেড়ে আসায় ক্ষান্ত দিয়েছিস। কান্ড শুনে মন্ত্রী পর্যন্ত রেগে আটটা। রে অর্বাচীন! নেতাজী মূর্তির গুরুত্ব বুঝিস না তুই বিশ্রামাগার বানাবি কী? ঘটনা বারবিশা রাজ্য সড়কের কাছে। তবে অর্বাচীনত্বের আরো এক কাঠি সরেস নমুনাও পাওয়া গেছে রে ভাই। ব্লিচিং ছেটানর টাকা নিয়ে ময়দা ছিটিয়েছে এক পাব্লিক। মুরগি ব্লিচিং খুঁটে খাচ্ছে দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিলেন এক গেরস্ত। তদন্তে জানা গেছে এই অপূর্ব সত্য!

হে গোমাতা! যদি সত্যি হও তবে এদের কেন গুঁতোও না?

হাতিরাগ

খুব রেগে গেছিল হাতির ছানা। একদিন দলের সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকছিল। কোথা থেকে বড়ো একখানা গাড়ি তাকে গুঁতো মেরে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। আহত ছানাটিকে দল সাময়িক ভাবে বহিষ্কার করে। তারপর সে ছানাকে সুস্থ করে জঙ্গলে ফেরৎ পাঠিয়েছিল বন দপ্তরের লোকজন। কিন্তু দলীয় কর্মীদের দেখা না পেয়ে সে কয়েকদিন ধরেই জঙ্গল লাগোয়া পথের পাশে ঘুর ঘুর

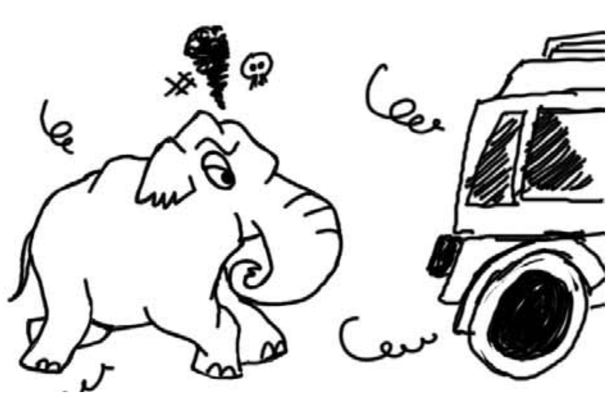

করছিল। পাব্লিক দেখলেই তেড়ে আসছিল গুঁতোবে বলে। তারপর একদিন দেখা গেল ব্যাটা রাস্তায় এসে গাড়ির ওপর আক্রমণের তোড়জোড় করছে। যাকে বলে শুঁড় তুলে তেড়ে আসা। বাস-ট্রাক-টেম্পো-বাইক— কাউকেই ছাড় দিচ্ছিল না সেই বিচ্ছু ছানা। আসলে গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়ে দল হারিয়েছে তো! তাই এত্ত রাগ! শেষ খবরে জানা গেছে যে সেই বিচ্ছুকে গ্রেপ্তার করে এক কুনকি মাতার কাছে পাঠান হয়েছে। এখন তার মুড-মেজাজ ভালো। নিমতি বাগানের কাছে।

আবার হাতি

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল এলাকার গ্রামটিতে হাতিরা তোলা তুলতে এসে এমন বাড়াবাড়ি করছে যে পাব্লিক আর গম্মেন্টের ওপর ভরসা করতে পারছে না। এবার তাঁরা গম্মেন্টের ওপর মহল, মানে আকাশে থাকা দেবদেবীদের হেল্প চাইছেন। বনকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মাইক বেঁধে শুরু করে দিয়েছেন নাম কীর্তন। অবশ্যি তার আগে মাসখানেক ধুন্ধুমার লেবার দিয়ে বানিয়ে ফেলেছেন আস্ত একখানা মন্দির। নিন্দুকেরা বলছে, হাতির অজুহাতে মন্দির বানিয়ে টু পাইস রোজগারের জন্যই হচ্ছে এসব। ভক্তেরা বলছেন, মোটেই না। কীর্তন চললে লোকজন থাকবে। হাতির সঙ্গে হাতাহাতি করতে সুবিধে হবে। তবে একটা সমস্যাও থেকে যাচ্ছে। কীর্তন শুনে যদি হাতিরা উত্তেজিত হয়ে আসরে নাচতে আসে, তবে? আমবাড়ির কাছে তাই খুব টেনশন এখন।

লুটি তো বোল্ডার

পড়শিদেশে নিয়ে যাবেন বলে লাইনে ট্রাক রেখে ডেরাইভারজি গেছেন হাওয়া খেতে। গাড়ি ভর্তি তাঁর বোল্ডার। নিয়ম-কানুনের কাজ হয়ে গেলেই ফুলবাড়ি সীমানা টপকে ঢুকে পড়বে বাংলাদেশে। তা এদিক ওদিক ঘুরে, চা-পানি খেয়ে ডেরাইভারজি পার্কিং-এ ফিরে এসে জার্কিং খেলেন। সে ট্রাকও নাই সে বোল্ডারও নাই। বোথ হয় ভ্যানিশ! চুল খাড়া করে ডেরাইভার মিঞা ছুটলেন থানায়। তারপর খোঁজ খোঁজ খোঁজ! শেষে খবর এল খালি ট্রাক পড়ে আছে রাস্তার ধারে। বোল্ডারগুলো বাংলাদেশে না নদীতে গেছে, সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করা যাচ্ছে যে বোল্ডারের দল নিজে নিজে গাড়ি থেকে নামেনি। তারা তো বাংলাদেশ যাবে বলে উঠেছিল। কেহ বা কাহারা তাদের জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। হতে পারে এটা বোল্ডার কিডন্যাপিং-এর কেস। বোল্ডারদের সোল্ডারে চাপিয়ে নিয়ে গেছে কেউ। ডাইনোসর?

জট

জটেশ্বর যখন তখন জট তো একটু হবেই। যেমন ধরুন এক জোড়া পুকুর কাটাতে পঞ্চায়েতের খচ্চা হয়েছে লাখ পাঁচেক। যে

যে গেরস্থের জমিতে কাটা হয়েছে. , তাঁরা আতস কাচ নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি তল্লাস করে এক ফোঁটা পুকুর খুঁজে পান নি। ভাবুন তো, আপনার এক বিঘে জমিতে বাড়ি আর বাগান আছে। সেখানে পেল্লায় পুকুর কাটা হলো। কিন্তু সে পুকুর আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না!!! পঞ্চায়েত অবশ্যি বলছে না যে গেরস্তরা পুকুর লুকিয়ে রেখেছেন। তা হলে কি কাটান হয়নি? না-ই যদি হয় তো লাখ পাঁচেক খচ্চা হলো কী করে? তা ১০০ দিনের টাকায় পুকুর কাটালে ছবি-টবি তুলে রাখার নিয়ম আছে না? ছবিও কি পুকুরের মত ভ্যানিশ? তা হলে দু-দুটো পুকুর, কেউ কেউ বলছেন যে দুটো নয় কো— তিনটে — কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে জটেশ্বরের পাব্লিক? এই নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে সেখানে। লোকজন খাটের তলা, মানিব্যাগ, আলমারি ইত্যাদি জায়গাতেও নাকি চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন ভালো করে। কে জানে, পুকুর যদি বেরিয়ে পড়ে।

টুকরাণু

কুকুরের চিৎকারে মালবাজারে ধরা পড়ল বারো ফুটি কিং কোবরা। এক ডজন চোরাই বাইক সমেত চোর গ্রেপ্তার শিলিগুড়িতে। রাসে মদনমোহনের প্রণামী বাবদ বিপুল খুচরো পাওয়ার আশঙ্কায় শিহরিত ট্রাস্ট। গাজলডোবার লক গেটে লিক। পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে গন্ডারদের থাকতে দেওয়া হবে। ডেঙ্গি মশাদের আঁতুরে হত্যা করতে টাকি মাছ ছাড়ার প্ল্যান শিলিগুড়িতে। নিজেদের জমি আদায় করতে কোমর বেঁধে নামার প্রতিজ্ঞা এসজেডিএ-র। মাথাভাঙ্গায় হেলমেটহীন বাইক চালকদের বিনি পয়সায় সচেতনতা মূলক চকলেট খাওয়ান হচ্ছে। বন্যার কারণে কোচবিহারের মাছেরা সব পালিয়ে যাওয়ায় পোনা ইমপোর্ট করতে হবে। মালবাজারে এল জঞ্জালবাহী টোটো। ডুয়ার্সে ট্রেন এখন লেট-লেটার-লেটেস্ট। আকাশ থেকে অচেনা যন্ত্রপতন হেতু শিহরন মাথাভাঙ্গায়। নাগরাকাটায় চার কিলোর শোল মাছ ধরা পড়ার পর মৎস্যপ্রেমীদের জিভে জল। গতরে বাড়ছে গরুমারা। 'ফান্দে পড়িয়া' কান্নাকাটি করা 'বগা'রা কমে আসছে ডুয়ার্সে।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)
৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)
৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি)
৮৬০৯০৮৮৯০৭
কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার **০৩৩-২২৫২৭৮১৬**

এলেনবাড়ি চা-ফ্যাক্টরি

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। এবারের পর্বে রইল এলেনবাড়ি ও ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানের পরিচিতি।

শ্যামলঘন বনানী, অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা, খরস্রোতা তিস্তা, শতাব্দীপ্রাচীন সব চা-বাগান দিয়ে ঘেরা আমাদের এই উত্তরবঙ্গ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে রত্নগর্ভা ডুয়ার্সের চা-বাগিচাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন জনপদ। মদেশিয়া নামে পরিচিত কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা সরল মনের মানুষগুলি এসে উপনীত হয়েছিল কোনও একদিন এই ম্যালেরিয়া-কালাজ্বল অধ্যুষিত এক জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ ভূখণ্ডে। এই ভূখণ্ডই ডুয়ার্স, সুন্দরী, ডুয়ার্স। কোচবিহারের উত্তর দিক এবং ভুটান পাহাড়ের দক্ষিণ উপত্যকায় অবস্থিত ছিল ১৮টা দুয়ার। প্রত্যেক দুয়ার ছিল কতগুলি তালুকে বিভক্ত। এই দুয়ারগুলি দিয়ে ভুটানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল বলে ইংরেজরা এই অঞ্চলকে বলত ডোর অব ভুটান। ফলত ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তরের বিশাল ভূখণ্ডই ডুয়ার্স। ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে যে বাণিজ্য পথ তার ট্র্যানজিট রুট ছিল এই আঠেরোটি 'দুয়ার' বা 'ডোর' বা ডুয়ার্স। এই দরজাগুলি দিয়েই ছিল সুপ্রাচীন ট্রেড রুট বা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ যা দিয়ে হিমালয়ের অন্তর্গত ভুটান পাহাড়েও প্রবেশ করা যেত। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ চা-বাগিচার চাদর, জলা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ বনভূমি, হস্তীযূথের বৃংহতি, ছোপছোপ হলুদের চকিত চমক, গন্ডারের দীপ্ত বিচরণ, ভীত হরিণের কাজল টানা চোখের মায়াবী চাউনি এবং কোচ, মেচ, রাভা, গারো, রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী মানুষের নন্দনকানন এই ডুয়ার্স। পশ্চিমে তিস্তা থেকে শুরু করে পূর্বে সংকোশ নদী পর্যন্ত যে বিশাল ভূখণ্ড তা ছিল সুদূর অতীতে কোচবিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু কোচবিহারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভুটান কোচবিহারকে দীর্ঘদিন দখল করে রাখে। কালিম্পংকে ১৭০৬ সালে ভুটান সিকিমের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তা দখল করে। দখল করার পূর্বে কালিম্পং যখন সিকিমের অংশ ছিল, তখন এর নাম ছিল ডামসাং বা ডালিমকোট। তিব্বতে যেতে হলে ডালিমকোট দিয়েই যেতে হত। ভুটানের সঙ্গে তিব্বতের ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তাই তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের মরিয়া প্রয়াসে ইংরেজরা ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছিল। এই লক্ষ্যেই ইংরেজরা চাইছিল ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা। সামান্য এক দানপত্রের মাধ্যমে গণ্ডগ্রাম দার্জিলিংকে ইংরেজ কোম্পানী সুদূরপ্রসারী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। বপন করা হয় দুটি পাতা একটি কুঁড়ির বীজ। অচিরেই সবুজ সোনার ভূখণ্ড সমৃদ্ধশালী করে তোলে ইংরেজদের রাজকোষ। শুরু হয় অন্য এক আর্থ-সামাজিক ইতিহাস। সেই ইতিহাসের টানেই সুদূর অতীতের ইতিহাসকে পাথেয় করে বেরিয়ে পড়েছি ক্ষেত্রসমীক্ষায়।

আজকের সফর এলেনবাড়ি, ওয়াশাবাড়ি। করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে হিমালয়ের চরণ ছুঁয়ে সবুজের গালিচার প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে করতে জাতীয় সড়ক আর রেলপথের সমান্তরাল অবস্থানকে মাঝেমধ্যে সঙ্গী করে যদি এগনো যায় তাহলে আমরা পৌঁছে যাব বাগরাকোট, ওদলাবাড়ি, ডামডিম হয়ে মালবাজার। কিন্তু মালবাজার আমরা পরে যাব। আজকের সফর আমার স্বল্পদূরত্বের। নামব বাগরাকোট অথবা ওদলাবাড়ি। যাব বাগরাকোট, ওয়াশাবাড়ি, এলেনবাড়ি, লিজ রিভার, শওগাঁও বা সোনালি হয়ে মানাবাড়ি, পাথরঝোরা— তাই একটু দ্বন্দ্বে পড়লাম শিলিগুড়ি জংশন থেকে সকাল ৭.১৫-এর বামনহাট প্যাসেঞ্জারে উঠে যে কোথায় নামব? বাগরাকোট না ওদলাবাড়ি? কারণ বাগরাকোট, ওয়াশাবাড়ি, এলেনবাড়ি নামতে গেলে বাগরাকোটে নামতে হবে আবার পাথরঝোরা যদি মানাবাড়ি হয়ে যাই তাহলে ওদলাবাড়িতে নামতে হবে। শেষ পর্যন্ত ওদলাবাড়ি নামব বলেই সিদ্ধান্ত নিলাম। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ওদলাবাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৪০ মিনিট লেটে সকাল ৯টায় নেমে ওদলাবাড়ি থেকে দীপকের সফরসঙ্গী হলাম। দীপক রায়। ভদ্র, শিক্ষিত ছেলেটির একটি অল্টোই জীবন জীবিকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। সেই অল্টোয় সঙ্গী হয়ে সোজা এলেনবাড়ি।

এলেনবাড়ি টি এস্টেট

মালবাজার মহকুমার অন্তর্গত এলেনবাড়ি চা বাগানটি। এলেনবাড়ি টি কোম্পানি লিমিটেজের অন্তর্গত। ৩এ, রিপন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ তে কোম্পানির হেড অফিস। দূরভাষ - ০৩৩-২২২৯ ২৪৪১। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বাগানটির ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যাগুলি দেখাশোনা করে। আইটিপিএ এর জলপাইগুড়ির সচিব অমিতাংশু চক্রবর্তী একজন দক্ষ সংগঠক

সামান্য এক দানপত্রের মাধ্যমে গণ্ডগ্রাম দার্জিলিংকে ইংরেজ কোম্পানী সুদূরপ্রসারী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। বপন করা হয় দুটি পাতা একটি কুঁড়ির বীজ। অচিরেই সবুজ সোনার ভূখণ্ড সমৃদ্ধশালী করে তোলে ইংরেজদের রাজকোষ।

যিনি চা-বাগান মালিকপক্ষের অন্যতম মুখ্য উপদেষ্টা। ১৯৬৭ সালে বর্তমান কোম্পানি বিগত কোম্পানির কাছ থেকে বাগানটির পরিচালনভার গ্রহণ করে। ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ আট জন। বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার ডি. আর. চৌধুরী, যোগাযোগ ৯৭৩৫০০১৭১০। বাগানে ট্রেড ইউনিয়নের বাড়াবাড়ি নেই। দাবি আছে ন্যূনতম মজুরির। রেশন, বোনাস, পিএফ, গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত প্রশ্নে একেবারেই যে আন্দোলন হয় না তা নয়, কিন্তু আপোষ মীমাংসার মাধ্যমেই ম্যানেজমেন্ট পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সেগুলি সমাধান করেন। বাগানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দুটি। এগুলি হল সিবিএমইউ এবং পিটিডব্লিউ ইউ। গ্রস এরিয়া ৩৮০.০২ হেক্টর। গ্র্যান্ট এরিয়া ৩৬২.০২ হেক্টর। আপরুটেড এরিয়া ৬৯.৬৬ হেক্টর, রিপ্ল্যান্টেডও হয়েছে সমপরিমাণ বাগিচাক্ষেত্র। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ২২৯.৪৬ হেক্টর। প্ল্যান্টেশন এরিয়া ২২৯.৪৬ হেক্টর। প্রতি হেক্টর জমি থেকে ১৭০০ কেজির মতো কাঁচা চা-পাতা ফ্যাক্টরিতে আসে প্রসেসিংয়ের জন্য।

এলেনবাড়ি টি কোম্পানিতে সাব স্টাফ ১০৭ জন। শূন্যপদ নেই। ক্লার্কের সংখ্যা বড়বাবুকে ধরে ১০ জন। শূন্যপদ - ২। ক্ল্যারিক্যাল বা টেকনিক্যাল স্টাফ ২১ জন; শূন্যপদ নেই। মোট শ্রমিক পরিবার ৩১১। মোট জনসংখ্যা ২৫৪২। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ৫১৯। শেষ অর্থনৈতিক বছরে কোনও ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ করা হয়নি। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত কর্মী এবং স্টাফের সংখ্যা ৬৭। কম্পিউটার অপারেটর একজন। সাব স্টাফ ২৬। সাব স্টাফ (ক্ল্যারিকাল) ৬ জন। মেডিক্যাল স্টাফ ২ জন। মোট শ্রমিক ৬২১। শ্রমিক পরিবারগুলির উপর নির্ভরশীল অ-শ্রমিক ১৯২১।

এলেনবাড়ি চা-বাগানে উৎপাদিত কাঁচা চা-পাতা বছরে প্রায় ১২ লক্ষ কেজি গড়ে। উৎপাদিত তৈরি চা প্রায় ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ কেজি কমবেশি। প্রায় ৪ লক্ষ কেজি চা-পাতা পার্শ্ববর্তী বাগান থেকে কিনে চা-পাতা প্রসেসিং করা হয় তাই বলা যেতে পারে ৬.৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ কেজি চা এলেনবাড়ি টি গার্ডেনে উৎপাদিত হয়। বাগানের চা ইনঅরগ্যানিক সিটিসি টি।

এলেনবাড়ি চা-বাগানের ব্যাঙ্কিং পার্টনার ব্যাংক অব বরোদা। এস.জি.আর.ওয়াই বা এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. এর সুযোগসুবিধা বাগান পায় কি না তা জানা হয়নি। বাগানের লিজ হোল্ডার এলেনবাড়ি টি কোম্পানি লিমিটেড। বর্তমানে চালু লিজের মেয়াদকাল ২০৩৪। পাকা বাড়ির সংখ্যা ২১৭, সেমি পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল ৯৪। ২১৭টি বাড়িতেই বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে। ৯৪টি সেমি পাকা বাড়ির মধ্যে ৬৩টি বাড়িতে ব্যক্তিগত নামে মিটার বসানো আছে। ৩১টি বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। মোট আবাসগৃহ ৩১১। মোট শ্রমিক ৬২১। প্রায় ১০০ শতাংশ শ্রমিকের বাসগৃহ আছে গড়ে ১.৫ থেকে ২ লক্ষ টাকা প্রতি বছর বাগানের শ্রমিকদের বাসগৃহ মেরামত বাবদ খরচ হয়, গত চার বছরে শ্রমিকদের নতুন আবাসগৃহ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। বাগানে ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী শৌচাগারের সংখ্যা মাত্র ৪৩। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের কাছে ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রথম আবেদন

প্রসেসিংয়ের জন্য বাগান থেকে সংগ্রহ করা চা-পাতা

জানানো হয়। ব্যক্তিগত মিটার বর্তমানে রয়েছে বাগিচার ২৮০টি শ্রমিক পরিবারের বাড়িতে।

বাগিচায় হাসপাতাল আছে। আলাদাভাবে মেল ফিমেল ওয়ার্ড বা আইসোলেশন ওয়ার্ডও আছে। মেল ওয়ার্ড ১টি, ফিমেল ওয়ার্ড ১টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ১টি। অপারেশন থিয়েটার নেই। অ্যাম্বুলেন্স আছে। গড়ে ৮০ জনকে বছরে বাইরে রেফার করা হয় চিকিৎসার জন্য। বাগিচার পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। এলেনবাড়ি চা-বাগিচায় ডাক্তার আছেন। নাম সঞ্জয় সরকার। স্থায়ীভাবেই বাগানে থাকেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা আর.এম.পি। ট্রেন্ড নার্স ১ জন। হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট ১ জন। মিড ওয়াইভস ১ জন। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাব সেন্টার এবং ওদলাবাড়ি ব্লক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ সহজলভ্য। মোটামুটি সাধারণমানের জ্বর-সর্দি-কাশি-পেটব্যাথা বা অন্যান্য ব্যথাবেদনা, গ্যাস-অ্যাসিড ইত্যাদির ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণেই সরবরাহ করা হয়। গড়ে প্রতি বছর ১০ জন মেটারনিটির সুযোগসুবিধা লাভ করে। এলেনবাড়ি টি গার্ডেনে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ করা হয়নি। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই। ক্রেশ ১টি। ক্রেশে কাপড় ধোয়াকাচার ব্যবস্থা, শৌচাগার, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে, বাচ্চাদের জন্য দুধ এবং খাবার সরবরাহ করা হয়। মোট অ্যাটেনডেন্ট ২ জন। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শিশুদের পোশাকের ব্যবস্থা আছে।

বাগিচার ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। পার্শ্ববর্তী বাগরাকোট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, এলেনবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল রয়েছে, বাগিচার ট্রাকে করে বাগানের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। স্কুলে নিয়ে যাওয়ার যানবাহন এই একটিমাত্র ট্রাকই। বাগিচায় গড়ে ২৮ লক্ষ টাকা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ড ফান্ড বাবদ জমা পড়ে। কোনও প্রভিডেন্ড ফান্ড বকেয়া নেই। মজুরি, রেশন, জ্বালানি, ছাতা, চপ্পল, কম্বল, কোনও কিছুই বকেয়া নেই। মজুরি চুক্তির নিয়ম মেনেই শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয়। এলেনবাড়ি চা-বাগিচায় বিগত ৫ বছরে গ্র্যাচুইটি প্রদানের গড়ে হিসাব ছিল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। মোট ৭ জন শ্রমিক অবসরগ্রহণের পর এই গ্র্যাচুইটি পায়, ৪২ জন শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি বকেয়া। বাগিচায় ২০ শতাংশ হারে বোনাস হয়। বোনাসের আওতাভুক্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো শ্রমিক বোনাসের জন্য গড়ে প্রতিবছর কোম্পানির ২২-২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

ওয়াশাবাড়ি টি এস্টেট

ওয়াশাবাড়ি টি এস্টেটের কর্ণধার সৌরজিৎ পাল চৌধুরীর ব্যবসার সাফল্যের চাবিকাঠি নিবিড় জনসংযোগ। সৌরজিৎবাবুর ঠাকুর্দা বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ১৮৮৪ সালে চায়ের ব্যবসা শুরু করেন। একদিকে কৃষি বেং অন্যদিকে শিল্প এই দুইয়ের মেলবন্ধরে লক্ষ্যে বিপ্রদাসবাবু চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শুধুমাত্র চাষবাসের মধ্যেই যেন অর্থনীতি সীমাবদ্ধ না থাকে। ইংরেজদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জমিদার থেকে তিনি আদ্যন্ত হয়ে উঠলেন চা-প্রেমিক একজন উদ্যোগী। ব্যবসার শুরুতেই আবাদি জমিতে তিনি চা-গাছ রোপন করতে শুরু করলেন। কিন্তু চা-গাছ বড় না হলে কোনও আয় হয় না। তাই তিনি দার্জিলিঙে বেনামী নামে একটা বাগান বিক্রি করে দেন। এবং সেই আয়কে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। দার্জিলিং-এর তিনধারিয়ায়, আসামের গুয়াহাটির কাছে ‘রাণী’ চা-বাগান এবং ‘যোগমায়া’ চা-বাগিচা ছিল যেটা পরে তিনি তাঁর ভাইপোকে দিয়ে দেন। প্রথমে বিপ্রদাসবাবু গান মেটালের ব্যবসা শুরু করেন। সেটাতে সাফল্য না আসাতে পরবর্তীকালে নীলচাষ করেন এবং পরিস্থিতির চাপে একটা সময়ে সেটাও বন্ধ করে দেন।

এক অদ্ভুত মানসিকতার মানুষ সৌরজিৎবাবু। একসময়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা-রসিকতা-তামাশায় সময় কাটত তাঁর। বনেদী পরিবার বলে মোসাহেবী বন্ধুর অভাবও হত না। ফলে সেরকম কোনও কাজে কোনওদিনই যুক্ত হননি। তখন সৌরজিৎবাবুর এক নিকটাত্মীয় তাঁর মাকে বলেন সৌরজিৎবাবুকে যে কোনও একটা কাজে নিযুক্ত করতে। তখন শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দিলেন এই চা কোম্পানিতে। রক্তের টান, পারিবারিক বংশেকৌলীন্য, বনেদীয়ানা এবং চা-শিল্পে নাড়ির টান নিয়েই তাঁর লম্বা সফর। সৌরজিৎবাবু চা-শিল্পকে একদম অন্যভাবে ভেবেছিলেন। তাঁর মতে ‘চা-শিল্প একটা ছোটখাট মিউনিসিপ্যাল এরিয়া। এখানে হাসপাতাল, স্কুল সবকিছু থাকে। সেগুলিকে দেখাশোনা করাটা খুবই জরুরি। আমি মনে করি যাঁরা বাগানে কাজ করেন তাঁরা যদি খুশি না থাকেন তাহলে আখেরে ক্ষতি হয় ব্যবসারই।’ সেই কারণে সৌরজিৎবাবু ওয়াশাবাড়ি চা বাগিচায় সবকিছু পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজান। তিনি জনসংযোগের মাধ্যমে চা ব্যবসায় জড়িথ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ, শ্রমিকশ্রেণি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা— সকলের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। সাধারণত চা-বাগিচাগুলিতে মালিকরা ম্যানেজারের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু বাগিচা শ্রমিকেরা ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানে তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে মালিকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে। যদিও ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়েই তিনি শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচনায় বসেন।

মাল মহকুমার ওয়াশাবাড়ি টি এস্টেট বাঙালি উদ্যোপতিদের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি বাগান যেটি ডুয়ার্সের চায়ের সুনাম

ওয়াশাবাড়ি চা-ফ্যাক্টরি

এবং ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য দায়বদ্ধ। ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানি লিমিটেড ১৯৫৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সুদীর্ঘ ৫৯ বছর ধরে দেশ তথা বিদেশের পানীয় রসিকদের চা পানের অভ্যাসকে বজায় রাখার লক্ষ্যে গুণগত মান বজায় রেখে কাজ করে চলেছে। ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানি লিমিটেডের তিনজন ডাইরেক্টর অনিক পাল চৌধুরী, সৌরজিৎ পাল চৌধুরী এবং নয়নতারা পাল চৌধুরী একে অপরের পরিপূরক হিসাবেই কোম্পানির সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতাকে নিজেদের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গেই সম্পৃক্ত করে লম্বা পথ পরিক্রমা করছেন। ডুয়ার্সে যেখানে ডানকানস বা অন্যান্য বৃহদায়তন বাগানগুলি নানা ধরনের সমস্যায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত, যেখানে চা শিল্পে ঐতিহ্য এবং বনেদীয়ানার পরিবর্তে হাত বদলের কালোয়াতি কারবারের মাধ্যমে একদল বেওসায়ী চায়ের মানের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে বিশ্ববাজারে তথা ভারতীয় চা রসিকদের বিরাগভাজন হচ্ছে, সেখানে সুস্বাদু চা প্রস্তুতকারক ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানি লিমিটেড-এর সাফল্যের ধারা এবং সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রেখে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মাথা উঁচু করে চলার রহস্য জানতে উপস্থিথ হলাম বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানে।

১৯৫৯ সালের ১৮ এপ্রিল শনিবার সম্পূর্ণ সময়ের জন্য ডাইরেক্টর হিসাবে কোম্পানির হাল ধরেছিলেন অনিক পাল চৌধুরী। ১৯৮৬ সালের ২৮ জুন আর এক শনিবার যোগদান করেন সৌরজিৎ পাল চৌধুরী এবং ২০০৬ সালের ৮ মে সোমবার নয়নতারা পাল চৌধুরী— এই ত্রয়ীর দক্ষতায় ভারতীয় চা সাম্রাজ্যে সুনামের সঙ্গে একটি নাম জ্বলজ্বল করছে সেটি হল ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানি লিমিটেড। কোম্পানির হেড অফিস কলকাতার ফ্যারাডে হাউস, গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলকাতা-১৩, এই ঠিকানায়।

ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানের ম্যানেজার রাজকুমার মন্ডলের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়পর্বের পর অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও শুনলেন আমাদের অর্থাৎ 'এখন ডুয়ার্স' এর পরিকল্পনা। অত্যন্ত মূল্যবান কিছু পরামর্শ পেলাম তাঁর কাছ থেকে। সৌম্যদর্শন, তরুণ ম্যানেজারের বাগান নিয়ে চিন্তাভাবনা, চা নিয়ে তাঁর উপলব্ধি বিষয়ক মত বিনিময় সাঙ্গ করে বের হলাম ক্ষেত্রসমীক্ষায়।

ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানের পরিকাঠামো অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বাগিচায় ট্রেড ইউনিয়ন তিনটি। এগুলি হল সি.বি.এম.ইউ, পি.টি.ডব্লিউ.ইউ.। বাগিচার গ্রস এরিয়া ৬৯৮.১৮ হেক্টর। গ্র্যান্ট এরিয়াও ৬৯৮.১৮ হেক্টর। আপরুটেড এরিয়া ২১.৫৯ হেক্টর, যেটাতে আবার নতুন করে চা-গাছ রোপন করা হয়েছে। সেচের সুবিধাযুক্ত এবং ড্রেনযুক্ত বাগিচাক্ষেত্র ৪৩৭.৫৫ হেক্টর। তবে সেচের বদলে বাগিচায় পাম্প হাউসের মাধ্যমেই জল সরবরাহ করা হয় অন্যান্য বাগানের মতোই। বাগিচার সার্বিক পরিচর্যার ফলে ২৫৫২ কেজি চা প্রতি হেক্টর আবাদি এলাকা থেকে উৎপাদিত হয়।

ওয়াশাবাড়ি চা-বাগিচায় সাব স্টাফ ৯৬ জন। অফিসে করণিকের সংখ্যা ৭ জন, ক্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১২ জন। শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৮৩৮ জন। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা শ্রমিকের সংখ্যা ৮৯৬ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৮৫ জন। কম্পিউটার অপারেটর ১ জন। মোট সাব স্টাফ (ও.এম.আর.ই) ৯৬ জন। ক্যালিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১৯। মেডিক্যাল স্টাফ ২ জন। মোট কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ১০৯৯। অ-শ্রমিক ৮৫০৯ জন। বাগিচাক্ষেত্র থেকে বছরে প্রায় ৪৫ লক্ষ কেজি কাঁচা চা-পাতা ফ্যাক্টরিতে আসে। সেখানে প্রসেসিং হওয়ার পর যে তৈরি চা পাওয়া যায় তার পরিমাণ ৯-১০ লক্ষ কেজি যা বিভিন্ন দামে এবং বিভিন্ন গ্রেডে নিলাম কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশীয় এবং বিদেশি বাজারে চলে যায়। ওয়াশাবাড়ি টি এস্টেটে অন্য বাগান থেকে পাতা কিনে এনে প্রসেসিং করে বছরে আরও প্রায় ৬ লক্ষ কেজি চা পাতা উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ বাৎসরিক গড় উৎপাদন প্রায় ১৬ লক্ষ কেজি চা। ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যসূত্র রিজিওনাল লেবার অফিস থেকে সংগ্রহ করার ফলে সাম্প্রতিককালের হিসাবে কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

ওয়াশাবাড়ি টি এস্টেট এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পে কোনও সাহায্য সহযোগিতা পায় না। ব্যাঙ্কের মূলধনী সহায়তা প্রদান করে থাকে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক। কোম্পানির নামেই বাগানের লিজ। অর্থাৎ

ওয়াশাবাড়ি চা-বাগিচার অফিসে মজুরী দেওয়ার জন্য আনা টাকা

লিজ হোল্ডার ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯/১১/২০৩২ পর্যন্ত চলতি লিজের মেয়াদ। বাগিচায় ব্যক্তিগত মিটারসহ বৈদ্যুতিক আলোর সুবিধাযুক্ত পাকাবাড়ির সংখ্যা ৭৭৫, সেমি পাকা বাড়ির সংখ্যা ১৩, অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ৫০ অর্থাৎ ৮৩৮। তবে বাড়ির সংখ্যা বেশকিছু বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রমিকের সংখ্যার আনুপাতিক বিচারে। মোট কর্মরত শ্রমিকসংখ্যা ১০৯৯। বাগিচায় শ্রমিকদের আবাসগৃহ প্রায় ১০০ শতাংশ। বিগত চার বছরে শ্রমিক আবাসগৃহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার, পূর্ণনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওয়াশাবাড়ি চা-বাগিচায় বৈদ্যুতিকরণের জন্য আবেদন জানানোর পর প্রথম পর্যায়ে ৭০৬ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬৯টি বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগের অনুমোদন দেওয়া হয়।

ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানে হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারি দুই-ই আছে। মেল ওয়ার্ড ১০, ফিমেল ওয়ার্ড ১০, আইসোলেশন ওয়ার্ড ৪, মেটারনিটি ওয়ার্ড ২ এবং অপারেশন টেবিলও রয়েছে। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে, বছরে গড়ে পাঁচ শতাধিক রোগীকে চিকিৎসার জন্য মহকুমা বা জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বাকি চিকিৎসা বাগিচার হাসপাতালেই করা হয়। ওয়াশাবাড়ি চা বাগিচার পাশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে যেখান থেকেও বাগিচা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা বা জেলা হাসপাতাল থেকেও সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। বাগিচায় রয়েছেন এম.বি.বি.এস ডাক্তার। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি পাস করেছেন, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৪৮০১২। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য এই ডাক্তারবাবু অত্যন্ত দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা সহকারে বাগিচা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করেন। বাগিচায় ট্রেন্ড নার্সের সংখ্যা ১। কম্পাউন্ডার, মিড ওয়াইভস এবং হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট আছেন। বাগিচায় কোম্পানির পক্ষ থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধের ব্যবস্থার জন্য অর্থ সংস্থান করা হয়। তবে জ্বল, পেট ব্যথা, সর্দি-কাশি এই ধরনের সাধারণ মানের চিকিৎসাই বাগিচা হাসপাতালে করা হয়। গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী ওদলাবাড়ি, মালবাজার বা শিলিগুড়ি বা নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়। বছরে গড়ে ১৫-২০ জন মেটারনিটির সুবিধালাভ করে বাগিচার পরিকাঠামোর দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল। হাসপাতালে রোগীদের উন্নতমানের খাবার দেওয়া হয় এবং ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয়।

ওয়াশাবাড়ি চা-বাগিচায় ক্যান্টিন আছে। ক্যান্টিনে ভর্তুকি দেওয়া হয়। ক্রেশ আছে দুটি, ওয়াশাবাড়ি বাগানে কোনও শিশু শ্রমিক নেই। শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনার প্রতি নজর রাখা হয়। ক্রেশে শৌচাগার, পানীয় জল, পোশাকের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের জন্য দুধ, বিস্কুট ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। শিশুদের দেখাশোনা করবার জন্য চারজন অ্যাটেনড্যান্ট আছে। বাগিচার শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্কুল বাস আছে। বিনোদনের জন্য ক্লাব এবং খেলার মাঠও আছে। প্রত্যেক বছর গড়ে ৫০-৬০ লক্ষ টাকা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ জমা দেওয়া হয়। কোনও পি এফ বকেয়া নেই। চুক্তি মোতাবেক বাগিচা শ্রমিকদের মজুরি, রেশন, জ্বালানী ইত্যাদি দেওয়া হয়।

ওয়াশাবাড়ি চা-বাগিচায় বোনাস ঘোষণা হওয়ার পরের দিনই বোনাস মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। শ্রমিকরা দিনের শেষে মজুরি পেলে খুশি থাকে এই আপ্তবাক্যটা বহু বাগান মালিক না বুঝলেও শ্রমিকরে মন জয় করার এই সহজতম পন্থাটা সৌরজিৎবাবু বুঝতে পেরেছিলেন বলে শ্রমিক অসন্তোষ নেই বাগানে। সৌরজিৎবাবুর মতে, সবচেয়ে ভাল চা বলে কোনও কিছু নেই। সবটাই মানুষের টেস্টের উপর নির্ভর করে আসলে মানুষ যেটা প্রতিদিন খায় সেটাতে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে যদি একটা অন্যরকমের চা খায় তাহলে তার কাছে সেটা একটু অন্যরকম লাগে। আসলে মানুষের বিশ্বাস আছে যে, ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানির দেওয়া নমুনাতে যে চা পাওয়া যায় সেটা ওয়াশাবাড়ির প্রোডাক্ট প্যাকেটে পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাসের ভিতটা তৈরি হয়েছে বলেই সততার সঙ্গে বাণিজ্য করে ১০০ বছরেরও পুরনো এই পারিবারিক ব্যবসাকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানির কলকাতা অফিসে ব্যাঙ্ক বা অ্যাকাউন্টসের কাজ করবার জন্য আছে ১০ জন কর্মী। চা-বাগিচায় আছে ১১০০ জনের মতো স্থায়ী কর্মী। তাছাড়া জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সারা বছরের উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ উৎপাদিত হয়। তাই এই সময়ে আরও হাজারখানেক লোক নেওয়া হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা এই উদ্যোগীর চায়ের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসাই তাঁকে শতাব্দী প্রাচীন এই ব্যবসাতে টেনে আনে। চা ব্যবসার প্রতি আগ্রহ ছিল বলে কাজ বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি। চা ব্যবসার মূল বিষয়টা একই বলে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়েছে এবং অনেক বেশি আধুনিক হয়েছে। সেগুলো কাজ করতে করতেই শিখেছেন সৌরজিৎবাবু। দেশীয় বাজারে চা বিক্রি করাই ওয়াশাবাড়ির কর্ণধারের প্রধান লক্ষ্য। কারণ ভারতের দেশীয় বাজারে চা বিক্রির ক্ষেত্রটা এতটাই বেশি যে এক্সপোর্ট করার মতো ভ্যালু পাওয়া যায় এখানে। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এক্সপোর্টে যেতে অসুবিধা নেই ওয়াশাবাড়ি টি কোম্পানির। মাসে গড়ে ১০ দিন বাগানে থাকেন সৌরজিৎ পাল চৌধুরী। বাগানে এসে নিজের কাজের দেখাশোনা করেন, কোথায় নতুন কী করা যায় আর কী করলে ভাল হয় সেটা দেখেন আর অন্যদিকে চা-বাগিচায় এলে একটা মানসিক পরিবর্তন হয় যেটা খুব ভাল লাগে সৌরজিৎবাবুর। আর এই ভালবাসার টানেই শতাব্দী প্রাচীন এই কোম্পানি এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ডুয়ার্সের মাটিতে।

দেবপ্রসাদ রায়

৮৭-র পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গৃহবন্দি হওয়ার আগেই দেশ জুড়ে বহু মিটিঙে অংশগ্রহণ করেছিলেন লেখক, যা তাঁর সময়সাময়িক নেতাদের বায়োডাটায় পাওয়া যাবে না। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় অসুস্থ শরীর নিয়ে পাঞ্জাবে ভোটের প্রচারে কাজ করে যাওয়া। সেই সময় দল ভোটে খারাপ ফল করলেও লেখকের মনে বিশ্বাস ছিল যে একদিন আবার জেতা শুরু হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে শুরু হল মন্ডল ও কমোন্ডলের লড়াই। লেখকের দিল্লির অফিস হয়ে উঠল মন্ডল বিরোধী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। '৯১-এর ২১ মে রাজীবজীর মৃত্যু। এ.আই.সি.সি. থেকে নির্বাসিত হয়ে নিজের প্রতিই বিশ্বাস হারালেন। ঠিক করলেন দিল্লি থেকে পাকাপাকিভাবে ফিরে আসবেন রাজ্যে।

।।পর্ব ৪৭।।

যদিও '৮৭-র অক্টোবরের পথ দুর্ঘটনা আমাকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল প্রায় দশ মাস— কিন্তু তার আগেই অনেকগুলি জেলার শিবিরে যোগ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি মোট ১৬৭টি জেলায় যাওয়ার নজির সৃষ্টি করেছি। যা সম্ভবত আমাদের স্তরের কোনও নেতার বায়োডাটায় খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

'৮৫-তে ২২ জনের নমিনেশন হয়েছিল, '৮৭-তে নেহেরু যুব কেন্দ্র আমার পরামর্শে স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা (এম.ও.এ-তে প্রথম সাতজন সাক্ষরকারীর আমি একজন) ঘোষিত হওয়ার পর ৮৫ জন দলের ছেলে যুব কো-অর্ডিনেটর পদে এন.ওয়াই.কে.-তে নিযুক্ত হয়েছিল, যারা এখন সোয়া লাখ টাকা মাইনেতে ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ করছে। আর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি প্রচুর।

পাঞ্জাবে যেদিন ভাটিন্ডায় ক্যাম্প থেকে বের হচ্ছি, খবর এল, জলন্ধরে কংগ্রেস এমপি যোগিন্দার পাল পান্ডেকে খালিস্তানিরা হত্যা করেছে। কোট কাপুরা হয়ে যখন জলন্ধর পৌঁছালাম, তখন রাত দশটা। সতপাল মিত্তল সাহেব (এম.পি. এবং ভারতী টেলিকম খ্যাত সুনীল মিত্তলের বাবা) একা বসে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্তনা দিচ্ছেন।

গুরুদাসপুর জেলায় ক্যাম্প করতে মাধোপুর গিয়েছি গায়ে জ্বর। ক্রোসিন খেয়ে কোনওরকমে প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করছি। যখন জলন্ধরের উদ্দেশে রওনা দিলাম তখন ধুম জ্বর। মারুতি ৮০০-তে পাঁচ জন। সতপাল পরাশর, আমি, কিশোরী (আজকের আমেঠি রায়বেরিলির ভারপ্রাপ্ত কে. এল. শর্মা) ও দু'জন গানম্যান। সতপাল বিধায়ক, আমার এ অবস্থা দেখে ওর গানম্যান বলল গুরদাসপুর পুলিশ লাইন থেকে একটা কম্বল নিয়ে নিই, স্যার একটু আরাম পাবে। এসব করতে করতে রাত দশটা বেজে গেল। রাত ১টায় চক মেহেরা। ভিনদ্রেনওয়ালের মুক্তাঞ্চল এবং সেখানেই টায়ার পাংচার। সতপাল বলল, আমি টায়ারটা পাল্টে নিচ্ছি, সবাই নিচে নেমে দাঁড়াও। জায়গাটা অন্ধকার ও জঙ্গলময়। অভিজ্ঞ গানম্যান দু'জন দু'পাশের ঝোপের আড়ালে চলে গেল, খানিক পরে অন্ধকার ফুঁড়ে চার মূর্তি বেরিয়ে এল, চারজন লম্বা-চওড়া শিখ। গুরমুখীতে কিছু জিজ্ঞেস করাতে কিশোরী উত্তর দিয়েছে কী দেয়নি, দু'পাশ থেকে ঝোপ সরিয়ে গানম্যান দু'জন এসে অশ্লীল গালিগালাজ করে স্টেনগান তাক্ করে ওদের তাড়ালো। ইতিমধ্যে স্টেপনি লাগানো হয়ে গিয়েছে। আমি জ্বরে কাবু। ২৫ কিলোমিটার এসে আবার পাংচার। এবার স্টেপনিও নেই। সতপাল গানম্যান একজনকে বলল, 'যা কাছের থেকে টায়ার বানিয়ে নিয়ে আয়'। আমি বললাম, আমি এভাবে থাকবো না। যে ভাবেই হোক আমি যাবোই। দু'জনের একজন আবার স্টেন দেখিয়ে একটা সবজির গাড়ি থামাল। ড্রাইভার বেজার মুখে আমাকে তার পাশে বসিয়ে নিল। আর কিশোরী ট্রাকের পিছনে সবজির বস্তার ওপর। জলন্ধর বর্ডারে এসে পুলিশ আর সবজির গাড়ি শহরে ঢুকতে দেবে না। আমি কম্বল গায়ে দিয়ে বসা। ক্লিনার পরিচয় দিয়ে ২০ টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেলাম। ড্রাইভারের কাছ থেকে নিয়ে বিড়ি টানছিলাম বলে ওদেরও

বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়নি। রাত তিনটেয় এসে হোটেলে ঢুকে একটা ঘর নিয়ে ন'টা পর্যন্ত সামান্য ঘুমোলাম। সকাল দশটায় সতপাল এসে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুসি ঠিক হো'।

শেষ বিদেশ যাত্রা '৮৮-তে। তখনও বার্লিনের দেওয়াল ভাঙেনি। ইস্ট জার্মানি থেকে আমন্ত্রণ ছিল। রাজীবজী শুনেছিলেন ইস্ট জার্মানিতে হাড়ের ভাল চিকিৎসা হয়, মাস্তানী-কে বললেন ডি পি কে পাঠাও। ও' দলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ওর ইনজুরি-টাও দেখিয়ে আসবে। ওরা যদি নতুন কোনও পথ বাতলে যেটুকু সমস্যা আছে, তার নিরসন করতে পারে। আমি তাই আমার টোটাল মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক আর এল ভাটিয়া নেতা, আমি আর অরবিন্দ নেতাম সঙ্গী। লিপজিগ, সোহোরিন, ড্রেসডেন আরও দু-চারটে শহরে যাওয়া হল। মাঝে এক চাষির বাড়িতে নিয়ে ওখানকার রুরাল লাইফ দেখান হল। সবই স্টেজ ম্যানেজেড। তবে বাড়ির মালকিন খুবই চৌখশ— যে কারণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে দায়িত্ব উনি ভালভাবেই পালন করেছিলেন। পূর্ব জার্মানির প্রশংসা ও পশ্চিম জার্মানির নিন্দা।

জার্মানি আন্ডার পপুলেটেড দেশ। জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কোনও পরিবারেই একটি বা দু'টির বেশি সন্তান নেই। প্রশ্ন উঠল কার ক'জন ছেলেমেয়ে। আমি আমার পাঁচ জন বলতে সবার হো হো করে হাসি। কারণ দলের ভেতর আমি সবচেয়ে ছোট আর সন্তান আমার সবচেয়ে বেশি। এমনকি আদিবাসী অরবিন্দ নেতামের চেয়েও। আমি খোলসা করে বললাম, চারজন অ্যাডপ্টেড আর সবচেয়ে ছোট যে তার আমি বায়োলজিকাল ফাদার। তারপর যতক্ষণ ছিলাম, সে ভদ্রমহিলা দোভাষী মারফৎ কেবলই বলছিলেন, 'গিভ মাই লাভ টু ইয়োর চিল্ড্রেন'।

মেডিক্যাল পেপারসগুলি যেমন ছিল, তেমনই ফিরিয়ে দিল। বলল, এ ইনজুরি আমরা ছোঁবো না। গড ক্যান ওনলি হেল্প হিম। সেই গডের জন্যই আমি আজও চলে ফিরে আছি।

দেখতে দেখতে '৮৯-এর নির্বাচন এসে গেল। রাজীবজী আমায় বললেন, তুমি কাস্ট ডেটা নিয়ে আমার পাশে থাকবে, আর যখন যা জানতে চাইব, বলবে। অনেককে বাঁচিয়েছি, অনেককে বাঁচাতেও দেখেছি।

মহারাষ্ট্রের এন কে কাম্বলের টিকিট কাটা যাচ্ছিল। আমি যখন বললাম ওই রাজ্যে বুদ্ধিষ্ট ৬ শতাংশ। তখন বৌদ্ধ হওয়ার কারণে কাম্বলে বেঁচে গেল। রাজস্থানে রাজ্যসভার একটা আসন ব্রাহ্মণ পাবে। দু'জন রিটায়ার করছে। ভুবনেশ চতুর্বেদী আর এইচ কে শর্মা। কে থাকবে! আমিও তখন রাজ্যসভায়। রাজীবজী বললেন, ডিপি, তুমি কী বলো। আমি বললাম, দু'জনেই পারফর্মিং। কিন্তু শর্মাজী নিজেকে জাহির করে, ভুবনেশজী দলকে ডিফেন্ড করে। ভুবনেশজী থেকে গেল।

লোকসভার আসন বন্টনে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ পাহাড়িয়া কিছুতেই নওল কিশোর শর্মাকে টিকিট দিতে দেবে না। কারণ উনি রাজীবজীর বিরুদ্ধে 'ওয়ার্কাস ফোরাম' বানিয়ে দল পাকিয়েছেন। রাজীবজী বললেন, ট্রু, কিন্তু ওনার মতো লোককে টিকিট দেব না, এটা হতে পারে না। এবং পাহাড়িয়াজীর ওপর চাপালেন না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন।

ভোট হল। আমরা অপপ্রচারের কাছে হেরে গেলাম। ১৯৭টা আসন এল। এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু রাজীবজী বললেন, আমি বিরোধী দলেই বসব। তখনও রাজ্যগুলির সরকার আছে। তিন মাসে বাদে তার ভোট হল।

'৮৯-এ আমাকে রাজীবজী সিইসি মিটিংয়ের প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করলেন, ডিপি তুমি লড়বে! কলকাতা থেকে কিন্তু বিশু (অরুণ দাস) ও রাজীব (দেব) লাগাতার বলছিল উত্তর-পশ্চিম-টা চাও সিয়োর জিতবে। তখন বেণু (দেবব্রত বসু) আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাথী। ও বলল, কখনও না। ওখানে ২৪৭ জায়গায় ইট পুজো হয়েছে। একদম হেরে যাবে। এই ফিডব্যাকের জন্য বললাম, আমি আপনার সঙ্গে প্রচারে থাকতে চাই। মূলতঃ ইউ পি-তেই ছিলাম, আর মাঝে মাঝে দিল্লি। বোঝাই যাচ্ছিল, হাওয়া অনুকূলে নেই।

তিন মাস পর যে ভোট হল রাজ্যগুলোতে তাতে আমি পাঁচ দিন রাজীবজীর সঙ্গে একটা ছোট প্লেনে দেশের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চষে বেড়িয়েছি। ২০/২৫টা মিটিং করতেন আর নিজেই প্লেন চালাতেন। চন্দ্রোক আর মীর চন্দানি— দুই পাইলটের একজন কো-পাইলট হয়ে যেত আর একজন স্টুয়ার্ট হয়ে যেত।

জয়পুর থেকে গৌহাটি। চার ঘণ্টার ফ্লাইট। রাত দেড়টায় নামার আগে প্রবল ঝড়ের মুখে পাখির মতো ছোট প্লেনটা একটা সমুদ্রে নৌকার খোলের মতো একবার ওপরে উঠছে আর নিচে নামছে। এর পরেও ল্যান্ড করলেন। এয়ারপোর্টের লোকগুলি ছুটে এসে বলল, ইউ হ্যাভ অ্যাটেন্ড দি জেনিথ অব ইয়োর ফ্লাইং ক্যারিয়ার। হোটেলে রাত তিনটের সময় ঘরে ঢোকার আগে আমায় বললেন, 'ডিপি, আজ সফর কুছ গরবর থা'।

আমি জানতাম, আজ হারছি। কাল জিতব। তাই মনোবল হারাইনি। বেশিদিন লাগল না। মন্ডল আর কমোন্ডলের লড়াই শুরু হয়ে গেল। দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে লাগাতার আন্দোলনের ফলে মরিস চক-টার নামই 'ক্রান্তি চক' হয়ে গেল।

আমি তখন এন.এস.ইউ.আই-এর দায়িত্বে। আমার নর্থ এভিনিউয়ের বাড়িটা অ্যান্টি মন্ডল আন্দোলনের হেডকোয়ার্টার্স হয়ে উঠল। সারা দেশে ২০০ ছেলেমেয়ে আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার পর বিজেপি সমর্থন তুলে নিল। সরকার পরে গেল। একটা সরকার হয়েছিল তারপর চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে, চার মাসের বেশি টেঁকেনি।

দিল্লি তখন পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের উদ্বাস্তুদের নিয়ে বেসামাল। দল আমাকে দায়িত্ব দিল, ত্রাণ কমিটি করে তাদের পাশে দাঁড়াবার। আমি তখনও সারভাইকাল কলার ব্যবহার করি। তার ভেতরেই প্রথমে পাঞ্জাবী ও পরে কাশ্মীরিদের শিবিরগুলিতে খাবার, কাপড়চোপর, ওষুধ, সবজি— সব নিয়ে নিয়ে যেতাম। দল ক্ষমতায় নেই। তাই সবই সংগ্রহ করতে হত। একবার কে কে বিড়লা তাঁর ট্রাস্ট থেকে দু'লাখ টাকা দিলেন। ফোল্ডিং খাট কিনে জম্মু গিয়ে নাগরোটা, তালাও তিলো, মুঠি— শরণার্থী শিবিরগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিলি করলাম। ওরা নিচ্ছেও আর গালিও কংগ্রেসকেই দিচ্ছে। আপনাদের জন্যই আমাদের এই দুর্ভোগ। তাই ত্রাণের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবেও ওদের মোকাবিলা করতে হত।

আবার ভোট। এবার আমি আসানসোলে প্রার্থী হলাম। ভেবেছিলাম নিচে চারটে সিটিং এমএলএ আছে। ভাল সিট। কিন্তু চারজনের

'৮৯-এ আমাকে রাজীবজী সিইসি মিটিংয়ের প্রথম দিনেই জিজ্ঞেস করলেন, ডিপি তুমি লড়বে! কলকাতা থেকে কিন্তু বিশু (অরুণ দাস) ও রাজীব (দেব) লাগাতার বলছিল উত্তর-পশ্চিম-টা চাও সিয়োর জিতবে। তখন বেণু (দেবব্রত বসু) আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাথী। ও বলল, কখনো না। ওখানে ২৪৭ জায়গায় ইট পুজো হয়েছে। একদম হেরে যাবে।

ভেতর কেবল মানিক উপাধ্যায়কে বাদ দিলে আর সবাইকে এলাকার লোক হারাবে বলে ঠিক করেই রেখেছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো নির্বাচনের প্রচারের শুরুতেই একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল। সেই সুযোগে বিজেপি তপানন্দ ব্রহ্মচারী বলে একজন গেরুয়াধারীকে দাঁড় করিয়ে দিল। কোথাও কোনও এজেন্ট নেই, পোলিং বুথ নেই— এক লক্ষ ৩৫ হাজার ভোট নিয়ে গেল। আমি হেরে গেলাম। তবে প্রাসঙ্গিকতা হারালাম না।

৭ মে আমার জনসভা করে রাজীবজী গেলেন। ২১ মে সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। তার সহানুভূতিতে ভর করে নরসিমা রাওয়ের সরকার হল। কিন্তু তাঁর কাজ হল বেছে বেছে রাজীব ঘনিষ্ঠদের বাইরে রাখা। পাঁচ বছরে একবারই একটা কাজ দিয়েছিলেন। সুরজকুণ্ডে একটা শিবির হল। তার সঞ্চালন করবার ভার দিলেন, তাও আহমেদ প্যাটেলকে মাথার ওপর বসিয়ে।

আমি থেমে থাকিনি। '৯২ সালে রাজীবজীর স্মৃতিতে ২১ মে তালকাটোরা স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা করেছি। '৯৩ সালের ১৯ নভেম্বর কলকাতার ইন্ডোর স্টেডিয়াম ভর্তি করে ইন্দিরাজীর জন্মদিন পালন করেছি।

'৯৫ সালে নজরুল মঞ্চ কানায় কানায় ভর্তি করে ৯ অগাস্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা অনুষ্ঠিত করেছি।

'৯৪ সালে জলপাইগুড়ির চালসার মাঠে আদিবাসী শহীদদের স্মৃতিতে স্মারক সৌধ নির্মাণ করে বিশাল আদিবাসী সমাবেশ করে চা-বাগানে পঞ্চায়েতীরাজের দাবী জানিয়ে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছি। দল পাশে থাকেনি, মানুষ পাশে থেকেছে।

।।পর্ব ৪৮।।

সব মিলিয়ে ২৬ বছর দিল্লি ছিলাম। '৭৯ সালে গিয়েছিলাম, ২০০5 সালে পাকাপাকিভাবে ফিরে আসি। তবু রাজ্যের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। এমন কী জেলার সাথেও নয়। '৯২-তে যখন বাবরি ভাঙল, তখন আমি কলকাতায়। দাঙ্গা যাতে না ছড়ায়, তার জন্য সব দলের (বিজেপি বাদে) নেতাদের নিয়ে রোজ জ্যোতিবাবু মিটিং ডাকতেন রাইটার্সে। কংগ্রেস থেকে প্রিয়দা, সুব্রতদা, আমি, সোমেনদা, মমতা— আমরা সবাই যেতাম। উনি একদিকে সবাইকে আপডেট করতেন এবং কোথায় কোথায় সমস্যা হতে পারে— রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দরকার, সে ব্যাপারে অবহিত করতেন। এখানে তেমন কোনও বড় ধরনের সমস্যা হয়নি। শুধু সংখ্যালঘুদের অস্থায়ী শিবির ছিল। পরে জেনেছিলাম, প্রোমোটাররা বস্তি খালি করার জন্য এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেকগুলি জায়গায় বস্তিতে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছিল।

কিন্তু মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর— কোথাও কোনও গন্ডগোল হয়নি, পশ্চিমবাংলার ধর্মনিরপেক্ষতার আধার এতোই গভীরে প্রোথিত ছিল।

'৯৬-এর লোকসভায় আমি লড়তে চাইনি। কারণ পরিণতি অজানা ছিল না। তবুও দুটি যুক্তিতে আমি রাজি হয়েছিলাম, একটা বার্তা যাবে নরসিমা রাও আমাকে

যা হওয়ার তাই হল, যত না ভোটে হারলাম তার চেয়েও বেশি গণনায় হারলাম। মিক্সিংয়ের এক ফর্মুলায় ২৪ ঘণ্টা পর যখন আমার এজেন্টরা আর না ঘুমিয়ে না থাকতে পেরে বেরিয়ে এসেছে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরা একতরফা গণনার নামে একটা প্রহসন না করলে হয়ত ব্যবধানটা অনেকটা কম হত।

লোকসভা লড়ার ক্ষেত্রে যোগ্য মনে করেছেন। দুই, জেলা কংগ্রেস আমাকে ছাড়া আর কাউকে প্রার্থী করতে রাজী হচ্ছিল না। দল করা লোক। তাই দলের এই দাবীকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। যা হওয়ার তাই হল, যত না ভোটে হারলাম তার চেয়েও বেশি গণনায় হারলাম। মিক্সিংয়ের এক ফর্মুলায় ২৪ ঘণ্টা পর যখন আমার এজেন্টরা আর না ঘুমিয়ে না থাকতে পেরে বেরিয়ে এসেছে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরা একতরফা গণনার নামে একটা প্রহসন না করলে হয়ত ব্যবধানটা অনেকটা কম হত।

ইতিমধ্যে দলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে নরসিমা রাওকে দিয়ে চলবে না। আমি হেরেছি, দলও হেরেছে। রাজীবজীর সহানুভূতি ২৪৪টি আসন দিয়েছিল। এক বাবরি মসজিদ তাকে ১৪৫টি-তে নামিয়ে দিয়েছে।

আমি আমার এনজিও-র মাধ্যমে একটা আন্দোলন চালাচ্ছিলাম। 'ভারত নির্মাণ'। ভারতের নির্মাতা ও নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাগুলির একটি দিনপঞ্জী তৈরি করে ভারতবর্ষের ১১০টি স্থানে সেই দিনগুলিকে পালন করে নব্বইয়ের দশকে কলকাতায় একটা চিত্র প্রদর্শনী করলাম। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। 'প্রতিদিনের প্রণাম'।

তারপর দু'বছর দেশজুড়ে যে প্রোগ্রাম হ'ত তার সমাপন অনুষ্ঠান ১০ জনপথে হ'ত। তখন অনেকেই নরসিমা রাও রুষ্ট হবে ভেবে ১০ জনপথের দিকে পা-ও মাড়াতো না। আমি আমার ছেলেদের নিয়ে ওখানে সভা করে সোনিয়াজীর হাত থেকে সবাইকে মেমেন্টো দেওয়াতাম। ওরা খুশি হ'ত। সোনিয়াজীর সঙ্গে ছবি উঠত। কর্মীদের তার চেয়ে বেশি কি লাগে! সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে প্রোগ্রামটিকে আর ধরে রাখা গেল না।

'৯২-এর বাবরি ভাঙার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল দল ভাঙবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই হল। তালকাটোরা স্টেডিয়ামে রিকুইজিশনড্ মিটিং ডেকে অর্জুন সিং, নারায়ণ দত্ত তেওয়ারিরা দল বিভাজিত করলেন। ভেবেছিলেন, সোনিয়াজী আসবেন। কিন্তু তিনি না আসলেও না ভেঙে উপায় ছিল না। কারণ যারা এসেছিল, তারা দল ভাঙার দাবী তুলে মঞ্চ প্রায় দখল করে নিয়েছিল। তবুও মূলস্রোত বেশ কিছুদিন নরসিমা রাওয়ের সঙ্গেই ছিল। '৯৬-এর নির্বাচন কোনও স্থায়ী সরকার দিতে পারেনি। যদিও এ রাজ্যে আমরা ভাল ফল করেছিলাম। ৯টি লোকসভা আর ৮৬টি বিধানসভার আসন জিতেছিল কংগ্রেস। তেওয়ারী কংগ্রেস যদিও কোনও দাগ ফেলতে পারেনি, কিন্তু যারা মূলস্রোতে রয়ে গেল তারাও সময়ের অপেক্ষায় ছিল। তাই '৯৭-তে সীতারাম কেশরীকে বসিয়ে নরসিমা রাওয়ের কাছ থেকে সভাপতিত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হল। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস রাজনীতিতে সীতারাম কেশরী বরাবরই ভিলেনের চরিত্র হয়ে থাকবেন, কারণ ওনার অদূরদর্শীতা ও একপেশে সিদ্ধান্তের পরিণতিতে এই রাজ্যে কংগ্রেস ভাঙল।

তখন কিছুদিন প্রতিবছরই ভোট। '৯৬, '৯৮, '৯৯— বছর বছর ভোট আর মিলিজুলি সরকার। কখনও দেবগৌড়া, কখনও গুজরাল কখনও তের১৩ দিনের বাজপেয়ী সরকার, কখনও আবার ১৩ মাসের সরকার। একটা দল রোজ ভাঙছে। বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে কংগ্রেস নেতারা সীতারাম কেশরীকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে বের করে সোনিয়াজীকে নিয়ে এল। '৯৮-এ তিনি হাল ধরলেন। '৯৯-এ দল জিতল না। কিন্তু ভাঙন বন্ধ হল। আমি এতদিন এ.আই.সি.সি. থেকে নির্বাসিত ছিলাম। এবার ভাবলাম স্থান পাব। কিন্তু তা'ও হল না। হবে কী করে! যাঁদের জন্য এই উত্থান রাজীবজীর সময়ে, তাঁদের জন্যই আজ একঘরে। সাগর রায়তাকে রাজ্যসভায় এনে আহমেদ প্যাটেলের

ক্রোধের কারণ হয়েছি। রাজস্থানের আবদুল মান্নানের নাম রাজ্যসভায় দেওয়াতে অশোক গেহলট-এর শত্রু হয়ে গিয়েছি। সত প্রকাশ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চলাতে হিমাচলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দ শর্মা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তাই যখন অনেকদিন মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর নীল আকাশটা হেসে ওঠে, আমরা বলি না— সকাল হয়েছে, বলি, 'সূর্য উঠেছে'। তেমনই যখন তরুণ গাঙ্গুলি বলল (উত্তরবঙ্গ পত্রিকার সাংবাদিক) আপনার নাম রাজ্যসভার জন্য

হার জিৎ তো জীবনের অঙ্গ। না মানলে জনজীবনে থাকা যায় না। কিন্তু মেলাতে পারছিলাম না, '৮০ থেকে '৮৯— যে যাকে পাঠিয়েছে, যে যখন এসেছে— সবাইকে পরিষেবা দিয়েছি। এক কলম চিঠি নিয়ে এলেও অসীম গুরুত্ব দিয়ে তার কাজ করে দিয়েছি। একটা সময় ছিল, রাজীবজী মানে 'মিঠু'— ওকে ধরলে রাজীবজীকে ধরতে পারবে। এমন কী কলকাতায় আন্তর্জাতিক ফুটববলের প্রস্তুতি চলছে, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে রাজীবজীর কাছে গিয়েছেন।

আলোচিত হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করিনি। তারপর যখন সিন্ধিয়াজীর ফোন এল, 'ডিপি, ম্যাডাম তোমাকে নিয়ে ভাবছে, তখন শুনলাম— আমার প্রার্থীপদ নিয়ে দলের বাইরে থেকেও সুপারিশ আছে। আমি যদিও শুরুতে শুনেছিলাম, সোনিয়াজীর প্রার্থী অর্জুন সেনগুপ্ত, দলের বিধানসভার সদস্যরা সোমেনদাকে চাইছে, কিন্তু তবুও লাস্ট ল্যাপে আমি এগিয়ে আছি।

অনেক কারণ মনে হতে লাগল। যুব কংগ্রেসের দিনগুলোতে সোমেনদার পদত্যাগপত্র যখন বরকতদা ও প্রণবদার সুপারিশে গৃহীত হ'বার মুখে, আমি, সঞ্জয়জীকে ফোন করে সেই সংকট থেকে সোমেনদাকে বের করে এনেছিলাম। যুব কংগ্রেসের ছেলেরা সাইকেলে দিল্লি গিয়েছে— আমি ফিরবার ভাড়া যোগাড় করে দিয়েছিলাম। আর প্রিয়দার জন্য আমার '৮৩ সালের ভূমিকা— তাই মনে হয়েছিল— এইসব মিলিয়েমিশিয়ে হয়ত একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। তবুও ভয় ছিল, সে সময়ে বিধানসভায় জিতে এসে যাঁরা রাজ্যসভার ভোটার হয়েছিল, তাদের অনেকের সাথেই আমার কাজ করার সুযোগ হয়নি। গুলশন মল্লিক, আবুল বাসার, সুধীর ভট্টাচার্য, সবুজ দত্ত, দেবীপ্রসাদ পন্ডা— এমন অনেকে ছিলেন যাদের আমাকে চিনিয়ে না দিলে চিনবার কোনও সুযোগ ছিল না। তারা কী ভাবছে। তবুও ভেবেছিলাম, এ রাজ্যে কখনও ক্রশ ভোটিং হয়নি। এ রাজ্যে রাজ্যসভার নির্বাচনে অর্থ কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। না হলে '৯০ সালে আমার যখন টার্ম শেষ হল, তখন ৩৭ জন বিধায়ক, তবুও দল কোনও প্রার্থী দেয়নি। কারণ '৮৭-তে ৪০ জন এমএলএ ছিল। তা'ও আবদুর রউফ আনসারি দু' ভোটের জন্য জিততে পারেনি। তাই যেখানে সরকারিভাবে ১১টা ভোট বেশি আছে, সেখানে না জিতবার কি আছে। কেউ কেউ বলল, মিঠুদা, আজকাল টাকা ছাড়া ভোট হয় না। তখন ভাবলাম আমাকে টাকা কে দেবে। যতদিন দিল্লিতে ছিলাম, ছেলেদের জন্য রাজীবজীর দরজায় গিয়েছি, কোনও শিল্পপতিকে নিয়ে তো যাইনি! পিয়ারলেস জাতীয়করণ করার দাবী নিয়ে গিয়েছি, পি সি সেনকে নিয়ে তো যাইনি। তাই টাকা লাগলেই বা পাবো কোথায়। কিন্তু কতগুলি অশুভ ঘটনা আমার বিশ্বাসটাকে টলিয়ে দিয়েছিল। এক, জয়ন্ত ভট্টাচার্য কেন দাঁড়াল। নিশ্চয়ই কোনও ভরসা পেয়েছে। আমি প্রিয়দার লোক বলেই প্রোজেক্টেড ছিলাম। কিন্তু উনি আমার প্রার্থীপদ ঘোষণা হওয়ার পর কলকাতা এসে রায়গঞ্জ চলে গেলেন, শুনলাম, ক্রিকেট খেলতে গিয়ে হাতের আঙুল ভেঙেছে। কলকাতায় এসে উডল্যান্ডে ভর্তি হয়ে গেলেন। আমার নির্বাচন লড়ছে তাপস রায়, অসিত মিত্র, অশোক দেব, শৈলজা দাস, শিবদাস মুখার্জিরা। সৌগতদা, সুব্রতদা ছাড়া কোনও বড় নেতা কেউ যুক্ত হলেন না। ভাবলাম এমন কখনও হয় না কি! রাজ্য সভাপতির বিধায়কদের নিয়ে কোনও ডিনার নেই, সি.এল.পি নেতা (অতীশ সিন্হা) প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করছে, কেউ কিছু বলছে না, তাহ'লে আসলে কে প্রার্থী, আমি না জয়ন্ত! ৫৪ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এত অসহায়তা কখনও বোধ করিনি। বুঝতে পারছিলাম, আস্তে আস্তে বধ্যভূমির দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু দিল্লিকে কী করে বলব! ওরা তো জানে ১১টা সারপ্লাস ভোট আছে। যা হওয়ার তাই হল। আমি হেরে গেলাম। কয় ভোটে, বড় কথা নয়। এই প্রথম দলের সরকারি প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার ভোটে নির্দলের কাছে হেরে গেল।

হার জিৎ তো জীবনের অঙ্গ। না মানলে জনজীবনে থাকা যায় না। কিন্তু মেলাতে পারছিলাম না, '৮০ থেকে '৮৯— যে যাকে পাঠিয়েছে, যে যখন এসেছে— সবাইকে পরিষেবা দিয়েছি। এক কলম চিঠি নিয়ে এলেও অসীম গুরুত্ব দিয়ে তার কাজ করে দিয়েছি। একটা সময় ছিল, রাজীবজী মানে 'মিঠু'— ওকে ধরলে রাজীবজীকে ধরতে পারবে। এমন কী কলকাতায় আন্তর্জাতিক ফুটববলের প্রস্তুতি চলছে, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে রাজীবজীর কাছে গিয়েছেন। সেই আমি এভাবে নিক্ষিপ্ত হ'লাম! নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে গেল। আরও অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, যারা হারাল— তাঁদের শান্ত করতে গোলাম নবি আজাদকে দিল্লি থেকে কলকাতায় ছুটে আসতে হচ্ছে ।

শ্রীকান্ত জেনা উড়িষ্যার প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন। উনি একদিন বললেন, ডিপি, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ওরা হারিয়ে অন্যায় করেনি, তুমি দাঁড়িয়ে অন্যায় করেছো।

সোনিয়াজী ডাকলেন। শুনলেন কী হয়েছে। আমি ঠিকই করে ফেললাম আর ওনাকে বিরক্ত করব না। নজরুলের একটা কবিতা বড় মনে পরছিল,

'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু
আর কোন গান গাহিবো না
কোলাহল করি সারা দিনমান
আর কারও ঘুম ভাঙিবো না
নিশ্চল নিশ্চুপ।
আমি আপনার মনে যাইবো পুড়িয়া
গন্ধ বিধুর ধূপ।।'

মন সেদিনই দিল্লিকে 'সায় নারা' করে দিয়েছিল, ফেরাটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা, ২০০৩ সালের রাজ্য জুড়ে তথ্য জানার অধিকারের পক্ষে জনমত গঠন, জেলার স্বার্থে ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন দাবী, চা-বাগানে পঞ্চায়েতী রাজ, ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা ও তাঁর সফল পরিণতি, তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেসের সূচনা— এই সমস্ত মাইলস্টোনগুলি কি কোনও পথের দিশাই দেখাবে না?

ফেরা হল। প্রখর রোদের পর বৃষ্টি যেমন শরীরটাকে জুড়িয়ে দেয়, ২০০৬ সালের বিধানসভার লড়াইয়ে জয় সেই তৃপ্তি এনে দিয়েছিল। দিল্লি থেকে ফিরে এলাম ডুয়ার্সে, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার মিলিয়ে বিধানসভায় দশ বছর ছিলাম। আর মানুষের মাঝে আজও আছি। বিধানসভার দশটা বছর নিয়েও হয়ত একদিন লিখব 'দিল্লি থেকে ডুয়ার্স'।

(শেষ)

উৎরাই তরাই

৫৭

সব কিছু তৈরি হতে হতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। ঠিক তখনই মেঘ ছিঁড়ে রোদ্দুর উঠল আকাশে। শারদ বিকেলের নরম হলদে আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক। গোপাল ঘোষ উত্তর দিকে তাকালেন। সাদা আর ছাই রঙা মেঘের আড়ালে ঝক ঝক করছে নীল পাহাড়। মনে হয় দুর্যোগ এবারের মতো কেটে গেল। শিকারে যাওয়ার পক্ষে অবশ্যই ভাল লক্ষণ।

বীরেনদের রাতের আঁধারে জঙ্গলে শিকার করতে যাওয়ার কাহিনিটি শহরে কীভাবে জানি ছড়িয়ে গেছে। বেশ কিছু যুবক ভিড় করেছে ভাসমান বজরার সামনে। সাপ্তাহিক জনমতের তরুণ সাংবাদিককে দেখা যাচ্ছিল বীরেনের সাক্ষাৎকার নিতে। সকালের পর বিকেলে আর আসবেন না ঠিক করেছিলেন গোপাল ঘোষ। কিন্তু ছোট একটা ভাতঘুম দিয়ে ওঠার পর সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন। ঘুমটা ভাল হওয়ায় তিনি বেশ ঝরঝরে বোধ করছিলেন। তাই মুখ চোখ ধুয়ে চা পান করতে করতে সহিসকে হুকুম দিয়েছিলেন গাড়ি জুড়তে। ভরা তিস্তায় বজরাটা আজই প্রথম সে অর্থে চলবে। সেটা দেখার লোভ সামলান কঠিন ছিল গোপাল ঘোষের পক্ষে।

অবশ্য ঘাটের থেকে বেশ খানিকটা তফাতেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আবহাওয়া ভাল হওয়ার কারণে তিস্তা বেয়ে একের পর এক নৌকো ঘাটে লাগছে। ঘাট ছেড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে নদীর দু-কূল প্রায় ভরে আছে জলে।

বজরা ছাড়ল পাঁচটার কাছাকাছি। কার্তিকের বিকেল এক্ষুনি ফুরিয়ে যাবে। গোপাল ঘোষ মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকলেন ভেসে যাওয়া নৌকোটির দিকে। স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে বলে গতি কম। একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছিল তাই। উৎসাহী যুবক দর্শকের দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে উঠে আসছিল রাস্তায়। দিনের আলোটা টুক টুক করে ফুরিয়ে যেতে যেতে এক সময় প্রায় মিলিয়ে গেল। তিস্তার ওপর নেমে আসল অন্ধকারের চাদর। দুলে দুলে যাওয়া বজরাটা ঢুকে পড়ল সেই চাদরের আড়ালে।

বীরেন সেই অন্ধকারের মধ্যে পাশে দাঁড়ান গগনকে বলল, 'তুমি বসো গগন। বজরা ছাড়ার পর থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ। আমাদের আচরণে কোনও রকম কৃত্রিমতা থাকলে মাঝিরা সন্দেহ করতে পারে।'

গগন একটু লজ্জা পেল। আসলে বজরাটা ঘাট ছেড়ে যাওয়া মাত্র তাঁর মনে এসে বাসা

বেঁধেছিল শোভার চিন্তা। বীরেনের কথা শুনে সে তক্তপোষের ওপর বসে বলল, 'একটা সিগারেট দাও ভাই! আসলে বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমরা যাচ্ছি!'

বাইরে একজন মাঝি পেট্রোম্যাক্স জ্বালাবার আয়োজন করছিল। এবার সেটা জ্বলল। দরজার ফাঁক দিয়ে অনেকটা আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। তারপর এলেন তারিনী বসুনিয়া।

'সব ঠিক আছে তো?' বীরেন জিগ্যেস করল। তারিনী বসুনিয়া জবাব না দিয়ে বললেন, 'ছাদে চলুন বাবুরা। বন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

সাহেবের কাছ থেকে ভাড়া করে আনা বন্দুকটা কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বীরেন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ! বন্দুক আছে তো। টোটাগুলো কোথায় গগন?'

তক্তপোষের নিচে রাখা ক্যাম্বিসের বড়ো ব্যাগটা থেকে টোটার বাক্স বের করে আনল গগনেন্দ্র।

'চলুন। দু-রাউন্ড ফায়ার করবেন।'

তারিনী বসুনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলেন। বন্দুক নিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বীরেনকে একটু কসরৎ করতে হলো। মাঝিরা ঠেলে না দিলে অবশ্যি গগনেন্দ্রর পক্ষে হয় তো ওঠাই হত না। বোটের ছাদ ব্যাপারটা এতদিন কেবল শুনেই এসেছিল ওরা। বজরা বোটের ছাদে উঠে তাই বুঝল, সেখানে ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকাটা প্রাথমিক শর্ত। ছাদের চারপাশে দু-হাত উঁচু কাঠের রেলিং থাকলেও সেটা নদীতে পড়ে যাওয়া আটকানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

মিনিট পনের কুড়ি পা টিপে টিপে হাঁটাহাঁটির পর দুলুনিটা সয়ে এলো দু-জনের পায়ে। ছদ্মবেশি তারিনী বসুনিয়া এরমধ্যে বন্দুকে বুলেট ভরে অপেক্ষা করছিলেন। ওদের হাঁটাহাঁটি লক্ষ্য করে বললেন, 'এই তো ব্যালেন্স এসে গেছে।'

'নিচের থেকে ছাদে দোলাটা বেশ বেশি।' গগনেন্দ্র সাফল্যের হাসি হেসে বলে। 'কিন্তু এই বন্দুক ফায়ার করবে কে? বীরেন, তুমি এই জিনিস আগে চালিয়েছ?'

'আপনি আগে ফায়ার করুন।' গগনের দিকে বন্দুকটা এগিয়ে দিয়ে বললেন তারিনী বসুনিয়া। 'খুব সোজা। কাঁধের সাথে সেটিংটা ঠিকমত করতে হবে।'

'উফফফ!'

সাগ্রহে বন্দুকটা হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাক করল গগনেন্দ্র। তারা ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয় সে আকাশে। সেই ঝকঝকে আকাশকে তাক করেই ট্রিগার টানল সে। প্রচণ্ড শব্দ, ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ। গগনেন্দ্র বন্দুকের ধাক্কায় কেঁপে উঠে সামলে নিয়ে হাসিমুখে বলল, 'এ তো কামান!'

'দেখি দেখি!' বীরেন উৎসাহে এগিয়ে এলো। বন্দুকটাকে ঘিরে কাছাকাছি হল তিনজন। তারিনী বসুনিয়া বললেন, 'দোমোহানিতে নৌকো দাঁড় করাতে হবে। প্ল্যান একটু বদলে গেছে।'

বীরেন এক সেকেন্ডের জন্য থমকে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'নতুন প্ল্যানটা কী?'

'চাঁদ উঠলে আমরা দোমোহানি ছেড়ে পশ্চিম তীর ধরে উজানে যেতে শুরু করব। তারপর কেউ মশাল দিয়ে সঙ্কেত জানাবে। তাঁকে তুলে নিতে হবে।'

মিনিট পনের কুড়ি পা টিপে টিপে হাঁটাহাঁটির পর দুলুনিটা সয়ে এলো দু-জনের পায়ে। ছদ্মবেশি তারিনী বসুনিয়া এরমধ্যে বন্দুকে বুলেট ভরে অপেক্ষা করছিলেন। ওদের হাঁটাহাঁটি লক্ষ্য করে বললেন, 'এই তো ব্যালেন্স এসে গেছে।'

'এ খবর আপনি কখন পেয়েছেন?'

'দুপুরের দিকে। যদি কিছু অদল বদল হয় তো সেটা দোমোহানি গেলেই জানা যাবে।'

বীরেন আর কোনও কথা না বলে বন্দুকটা নিয়ে তাক করল আকাশে। দেখা গেল বন্দুকের ধাক্কা তাঁকে বিচলিত করতে পারল না। গুলি ছোঁড়া হয়ে গেলে গরম নলের ওপর হাত বুলিয়ে সে শান্ত গলায় বলল, 'তাহলে মাঝিদের হুকুম দিয়ে দিন। চাঁদ কখন উঠবে?'

'আন্দাজ প্রহর শেষে। সাড়ে আটটা ন-টা।'

'দোমোহানিতে আমরা কী করব?'

'মাঝিরা বাজার থেকে মাছ কিনে ঝোলভাত রান্না করবে। আপনারা ঘাট-বাজার ঘুরে দেখতে পারেন। তবে আমি নৌকোতেই থাকব।'

'ঠিক আছে।' বীরেন হাসল। 'আমরা দু-জন ছাদে বসেই কাটিয়ে দেব।'

তারিনী বসুনিয়া বন্দুকটা নিয়ে নেমে গেলেন। একটু পরে বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে ওরা বুঝতে পারল নৌকোর মুখ ঘুরে যাচ্ছে। প্যাট্রোম্যাক্সের আলো তিস্তার অন্ধকারে কিছুদূর গিয়ে হারিয়ে যায়। তারপর সব কালো। দিনে আর রাতে নৌকো চালাবার মধ্যে ফারাকটা প্রায় আকাশ আর পাতালের।

বীরেন একটা সিগারেট ধরিয়ে বজরার ছাদে বাবু হয়ে বসল। অভ্যেস না থাকলেও উত্তেজনার কারণে দু-জন আজ সকাল থেকে সিগারেট ফুঁকে চলেছে। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল যে এ ব্যাপারে এরা একেবারে নবীশ।

'উপেনের সঙ্গে তাহলে দেখা হচ্ছে বলছ?'

বীরেনের প্রশ্নটা শুনে গগন এগিয়ে এলো। বলল, 'ভাবছি দেখা হলে কী বলব?'

'তোমাদের বিয়ের কথা তো সে জানেই।' বলল বীরেন। 'তাঁকে জোর খোঁজা হচ্ছে, এ খবরও সে অনুমান করেছে। মনে হয় না তাঁকে দেয়ার মতো খবর তোমার কাছে আছে। আমরা বরং তাঁর কথাই শোনার চেষ্টা করব।'

'ওকে ফিরিয়ে আনা যায়?'

'বাপ-মা-ভাই-বোন ছেড়ে দেওয়া মানুষ কি আমার তোমার কথায় ফিরে আসে গগন?' বীরেনের স্বরে দার্শনিক নিস্পৃহতা ফুটে ওঠে। 'প্রেমই পারে একমাত্র ফিরিয়ে আনতে।'

গগন হো হো করে হেসে উঠে তরল স্বরে বলল, 'এতক্ষণে একটা কাজের কথা বললে বটে! উফ! সব থম মেরে ছিল এতক্ষণ! উপেনে আর প্রেম মেলাতে পারাটা খুব কঠিন, বুঝলে?'

'তবে একটা জিনিস ভেবে দেখ ভায়া!' বীরেন একটু ঝুঁকে পড়ে বোঝাতে শুরু করল গগনকে। 'উপেনের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় কি কোনও অভিযোগ আছে? পুলিশের খাতায় সে কি টেররিস্ট? সুতরাং তাঁর লুকিয়ে কাজ করার দরকার কী? সে মিসিং। তাঁর খোঁজে লালবাজারে তদ্বির করা হয়েছে। তাঁকে খোঁজাও হচ্ছে— বাট হি ইজ নট ক্রিমিন্যাল। ইচ্ছে করলে গোপনে সে জলপাইগুড় বা জামালদহে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারত। কিন্তু রাখে নি। কেন জান?'

'দুর্বল হয়ে পড়বে বলে?'

'ঠিক ধরেছে তুমি।' বীরেন ছোট্ট করে দু-হাতে একটা তালি বাজিয়ে বলল। 'দূরে থাকাটা তাঁর কাজেরই অঙ্গ। পার্ট অফ হিজ প্ল্যান গগন! আজ দেখা হলে আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করব।'

বীরেন চুপ করল। ছপ ছপ করে দাঁড় টানার শব্দ মিশে যাচ্ছিল স্রোতের কলকল ধ্বনির সঙ্গে। গগন দূরে তাকাল। অন্ধকারে চাদরের বুকে হালকা হলদে আলোর ছাপ। ওটাই কি দোমোহানির ঘাট?

তারিনী বসুনিয়ার গলা ভেসে এলো নিচ থেকে। 'বোরলি কিনবি। আর কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা। হলুদ- লবণটা ভুলিস না। আর শোন! চাল কিন্তু কালো নুনিয়া।'

আনন্দে এক মাঝি চেঁচিয়ে বলল, 'ইয়া আল্লা!'

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

হেমন্ত পাহাড়-প্রেম এবং দার্জিলিং

ডুয়ার্সের ডায়েরি

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

হেমন্ত এসে গেল। ঈশ্বর এখন তাঁর নিজস্ব ইজেল থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবুজের বিভিন্ন শেড নির্বাচন করে সযত্নে তুলি বোলাচ্ছেন প্রকৃতির গায়ে। এই হেমন্তে তিনি ভিন্ন মাত্রা যোগ করছেন অনির্বচনীয় পাহাড়ের সৌন্দর্যে। হেমন্তের এই সময় পাহাড়ে এখন পরিষ্কার আকাস, নির্মল বাতাস, সরস লতাগুল্ম। হেমন্তের পাহাড় মানে স্বচ্ছতোয়া ঝরনা আর শিলার মিলন। হেমন্তের এই পড়ন্ত বেলায় পাহাড়ে একটু একটু করে জন্ম নিচ্ছে অনির্বচনীয় রূপকথা।

ডুয়ার্সবাসী বেশিরভাগ মানুষের মতো এই কলমচির মধ্যেও জন্ম থেকেই পাহাড়-প্রেম আছে। আশপাশে এমন কয়েকজন মানুষকে আমরা চিনি যাঁদের প্রথম জীবনে তেমন একটা পাহাড়-প্রেম ছিল না। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অসুখের মতো এই জিনিসটাও তাঁদের শরীরে ঢুকে পড়েছে। কর্তা-গিন্নি তখন দেখা যায় শরীর একটু ঠিক থাকলেই পাহাড়ে যাওয়ার টিকিট কাটছেন। কখনও সিকিম, কখনও দার্জিলিং বা কালিম্পং। আবার কখনও কুলু-মানালি, বদ্রীনাথ-কেদারনাথ।

বয়স বাড়লে হিমালয়ের ডাক যেন আরও বেশি করে কানে আসে। এক দম্পতির কথা জানি। সস্ত্রীক কেদারনাথে গিয়েছিলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কেদারনাথ থেকে গঙ্গোত্রীর পথ তেমন সুগম নয় বলে স্ত্রীকে কেদারনাথে এক সাধুর কুঠিয়ায় রেখে প্রৌঢ় মানুষটি অসীম উদ্দীপনায় গঙ্গোত্রী অবধি রওয়ানা দিলেন। প্রৌঢ়া বলতেন ওই কুঠিয়ার দিনগুলোর মতো শান্তি আর আনন্দ সারা জীবনে খুব কম পেয়েছি। সেই ভদ্রমহিলা একবার সেই কুঠিয়ার সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা এখানে জমির দাম কত? একটা বাড়ি বানিয়ে থাকা যায় না? সাধুবাবা উত্তরে বলেছিলেন, কেন, জমি কেন কিনবি? ইচ্ছে করলে আমার এখানে এসে থাকবি। আরে বেটি, পুরো হিমালয়টা তো তোর, শুধু শুধু একটা কোণে পড়ে থাকবি কেন?

বেড়ে খেলা বাঙালির চিরকালীন অভ্যেস। সত্তর বা আশির দশকে যাঁরা স্কুল যেতেন তাঁদের চোখে এখন চালশে পড়েছে, ইন্দ্রলুপ্তি ঘটেছে সময়ের নিয়ম মেনে, মুখে দাগ কেটেছে বলিরেখা। এখন তাঁদের অনেকেই হয়ত সংসার সামলাতে সামলাতে জেরবার। তবে ছোটবেলার কথা কি একেবারে ভুলে গিয়েছেন তাঁরা? উঁহু মনে তো হয় না।

সে সব ছিল সুখের দিন। চিলেকোঠার ছাদে উঠে ছোট ভাই বা বোনের হাতে লাটাই ধরিয়ে দিয়ে দুপুর থেকেই চলত তাঁদের যুদ্ধপ্রস্তুতি। কিন্তু সে কি কম ঝক্কি? হাওয়ার অভিমুখের সামনেই ডাইনোসরের মতো উঁচু

আখাম্বা তিনতলা সাবেকি সরকারদের বাড়ি। সেই বাড়ির ছাদের হেলে পড়া অ্যান্টেনা এড়িয়ে কিশোর ছেলেটি বাতাসে ভাসিয়ে দিত স্বপ্নঘুড়ির ইচ্ছে-বুদবুদ।

এই ইচ্ছে কি শুধুমাত্র জয়ী হবার জন্য? মোটেই না। টিফিনপয়সা জমিয়ে কেনা সামগ্রীই তার অ্যাডভেঞ্চারের ডাকটিকিট। সারা দুপুর কাচের গুঁড়ো দিয়ে সুতোতে মাঞ্জা দিয়ে সে তৈরি। বিকেলে সে তার স্বপ্নের পেটকাটি চাঁদিয়ালকে মেলে ধরত বাতাসে। একদম আকাশের শেষ সীমানায় সে পৌঁছে দেবে তার নিজস্ব ঘুড়িটাকে। এক সময় শেষ হয়ে যেত লাটাইয়ের সমস্ত সুতো। দূরে তারার মতো ছোট্ট ঘুড়িটাকে দিগন্ত দেবে বলে খুলে দিত লাটাইয়ের গিঁট। আস্তে আস্তে ঘুড়িটা এক সময় মিলিয়ে যেত সূর্যাস্তের পিছনে।

এই স্বভাবের জন্যই বাঙালির পুরী বা দিঘা তেমন একটা ভাল লাগে না। কৈশোরেই সে হারিয়ে যেতে চায় দূরে কোথাও। কোথায় আবার? পাহাড়ে। কৈশোরেই তার পাহাড় চাই। কেননা পাহাড়ের সব কিছুই অনিশ্চিত। এই রোদ তো এই বৃষ্টি। প্রত্যেক বাঁকে নতুন দৃশ্য। হিমালয়ের আরও অন্তরঙ্গ হাওয়া। নাম জানা, নাম না-জানা কত পাখি, প্রজাপতি, ফুল, গাছ— কী নেই! ভিতু পেটরোগা বাঙালিও সেজন্য বেড়াতে যায় দার্জিলিং। ট্রেকিং করতে ছোটে পাহাড়ের আরও একটু বেশি উঁচু জায়গা থেকে আকাশ দেখবে বলে। শীতল বাতাসকে স্পর্শ করবে বলে।

পাহাড়-ভালবাসিয়ে আর সমুদ্র-বিলাসীদের মধ্যে দেখেছি একটা চোরা আকচাআকচি লেগেই থাকে। আগেই বলা হয়েছে, এই কলমচি প্রথম দলে। আসলে হিমালয় তো সমুদ্রেরই সন্তান। তবু সমুদ্রকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি আকাশ ছুঁতে। পাহাড়ের প্রতিটা বাঁকেই নতুন বিস্ময় ওত পেতে থাকে। আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি যেতে কে না চায়! তাই পাহাড়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না।

পাহাড়ের মতো চমৎকার জায়গায় কুৎসিত কাণ্ডকারখানা ঘটলে তো স্থানীয় মানুষদের যেমন, আমাদের মতো পাহাড়প্রেমীদেরও ভাল লাগে না। যাঁরা সুন্দরকে সুন্দর করেই রাখতে চান তাঁরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন যাঁরা এই কাণ্ডগুলো ঘটান। অনেকে বর্তমান পাহাড়কে মনে করেন একটা নির্মিত সমস্যা, যা নির্মাণের দায় কোনও একজনের ওপর চাপানো যায় না। কোনও এক পক্ষের ওপরও হয়ত না। কিন্তু এই জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেল পাহাড়ের গোটা একটা প্রজন্ম। চরম ক্ষতিগ্রস্থ হল তাদের জীবনের প্রধান পর্ব। জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা, মাতৃভাষার অধিকার, নিজস্ব পরম্পরা ও সংস্কৃতি-চর্চার স্বাধীনতা, নিজের ধর্মাচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীই এসব নিয়ে সংবেদনশীল। কোনও ভাবে সেই অধিকার বিপন্ন হলে বা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তাদের দিক থেকে প্রতিবাদ আসবেই। এখানেও তার অন্যথা হয়নি।

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে গোর্খা সমাজের নেতাদের পৃথক রাজ্যের দাবি কোনও নতুন ব্যাপার নয়। এই ছবির মতো সুন্দর পাহাড়টিকে বাসযোগ্য করে তুলতে প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন ব্রিটিশরা। তার সঙ্গে ছিল কল্পনাশক্তি আর অধ্যবসায়ের মিশেল। খাড়াই ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ঘুরন্ত রাস্তা দিয়ে সমতল থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয় ট্রেন চালিয়ে তাঁরা তাঁদের সুদূর ও পাণ্ডববর্জিত উপনিবেশে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন ভিক্টোরিও প্রযুক্তিবিদ্যার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তাছাড়া বিশ্বখ্যাত দার্জিলিং চা, যা ব্রিটিশ সার্জেন আর্থার ক্যাম্বেল তৈরি করেছিলেন কুমায়ুন থেকে সংগ্রহ করা চিনা চা গাছের বীজ থেকে। তখনকার সহজপ্রাপ্য আসাম চা গাছ থেকে নয়। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তৈরি হল এক অপূর্ব স্বাদবিশিষ্ট ও সুঘ্রাণে ভরপুর হালকা চা, যা কেউই দুধ মিশিয়ে তার স্বর্গীয় বিভাকে আবিল করে দিতে চাইবে না।

যাঁরা স্থাপত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাঁরা অনেকে মনে করেন মানুষ যে শহরের বাসিন্দা, সে শহরের স্থাপত্যের ভিত্তিতে আঁকা হয়ে যায় তার মনন। দিল্লি-লন্ডন-প্যারিস-কলকাতা প্রত্যেকটি শহরই স্থাপত্যে স্বতন্ত্র। ভিন্ন। এই স্থাপত্য ও মানুষের জীবনযাত্রা মিশে গিয়ে তৈরি করে এক আশ্চর্য পরিধি।

এই ইতিহাসকে বদলানো যায় না। দার্জিলিংও তেমনই এক ধ্রুপদী ইতিহাসের শহর। দার্জিলিং মানে নিছক এক টুরিস্ট স্পট নয়। ব্রিটিশদের খুঁজে বের করা নৈসর্গিক শহর দার্জিলিংয়ের এক ঔপনিবেশিক ইতিহাস আছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, সিস্টার নিবেদিতা, জগদীশ চন্দ্র বোস, রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতো মানুষেরা। এই সমস্ত মহীরুহের সঙ্গে এই পাহাড়ের যোগাযোগের অমলিন ইতিহাস ভুলে যাওয়া কি কখনও সম্ভব?

বৃষ্টি, রোদ ও মেঘের মায়ায় ঢাকা এই শৈলশহরকে প্রাণের চেয়েও ভালবেসেছিলেন স্কটিশ মিশনারিরা। শিলংকে তাঁরা ‘স্কটল্যান্ড অব দ্য ইস্ট’ বলে তকমা দিলেও দার্জিলিংয়ের প্রতিও তাঁদের মোহ কিছু কম ছিল না। সে কারণেই দার্জিলিং ও কার্শিয়াং হয়ে উঠল উন্নতমানের স্কুলশিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্র।

বিদেশে থিতু হলে মানুষ তার প্রেমাস্পদের একটা ছবি নিজের শয়নকক্ষে রাখে। ব্রিটিশরা দার্জিলিং শহরকে গড়ে তুলেছিল তাদের স্বদেশের কোনও ছিমছাম হিল স্টেশনের রেপ্লিকা করে। রঞ্জন তথা নীহার মজুমদারের ‘শীতে উপেক্ষিতা’ উপন্যাসে সেদিন আবার ফিরে পড়া গেল। সেই সময় শীতের সময় বাঙালি বড় একটা দার্জিলিংমুখো হতেন না। স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডায় জমে যাওয়ার ভয়ে। শীতে উপেক্ষিতা উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট গিয়েছিলেন। হিমালয়কে জয় করার জন্য নয়। আদিগন্ত বিস্তার করা মৌনী সন্ন্যাসীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকা হিমালয়ের কাছে নতজানু হয়ে নিজের দীনতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত জাগতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার জন্য। দিন বদলেছে। এখন শীতের সময়ও পর্যটক দার্জিলিংকে ব্রাত্য করে রাখেন না। বরং শীতের দার্জিলিংয়ের অনন্য রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য ছুটে যান সেই পাহাড়ি শহরে।

দার্জিলিংয়ের মতো সযত্নে ব্রিটিশ লালিত একটি জেলাকে সদ্য স্বাধীন ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার সময় অনেকের মনে দ্বিধাবোধ কাজ করেছিল। দারিদ্র, বেকারি, অসাম্যের মতো সমস্যাগুলি সমতল থেকে উঠে এসেছিল পাহাড়ে। সম্প্রীতির চাইতেও বড় হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিষাক্ত হয় পারস্পরিক সম্পর্ক। সত্যজিৎ রায় জানতেন দার্জিলিংয়ের ইতিহাস ও চরিত্র। সে কারণেই তাঁর ‘কঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিতে ব্রিটিশভক্ত প্রাক্তন আমলা ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়প্রেমী আত্মীয় পাহাড়ি সান্যাল হয়ে ওঠেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। সেই ছবির আশাব্যঞ্জক শেষ দৃশ্যে কুয়াশা ভেঙে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। নেপালি একটি বাললকের সুরেলা গান ভরিয়ে তোলে পাহাড়ি বনভূমি।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের আগুন যখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে সেই পটভূমিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে একটি ভালবাসার উপন্যাস লিখেছিলেন এই কলমচি। ‘মেঘের পর রোদ’ নামে সেই উপন্যাসটি বেরিয়েছিল ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকার উৎসব সংখ্যায়। সেই উপন্যাস প্রকাশ পাবার পর কিছু পাঠকের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল। তাঁরা পাঠপ্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঋদ্ধ করেছেন লেখককে। তাঁদের সকলের কাছে বিনীত কৃতজ্ঞতা জানানো গেল। সব ঠিক থাকলে আসন্ন বইমেলায় এই উপন্যাসটি দুই মলাটে বন্দি হয়ে পৌঁছবে পাঠকের কাছে। আশা করা যায় তাঁদের প্রশ্রয় থেকে ‘মেঘের পর রোদ’ বঞ্চিত হবে না।

আনন্দময়ী

কোনও একসময় একটি গান শুনেছিলাম, যে গানটি শোনা ইস্তক বড়ই রহস্যময়ী এক নারীর ছবি সামনে এসে গিয়েছিল। আজও সেই নারীকে বড়ই ভালবাসি। সে কি মহাশক্তি? ম্যাজিশিয়ান? এই অদেখা রমণীকে মাঝে মাঝে চোখের সামনে স্পষ্ট হতে দেখেছি। ছোটবেলা থেকে আজ অবধি ডুয়ার্সের একটি অন্য ধাঁচের চরিত্র দেখে এসেছি। চারপাশে চা-বাগান, মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনপদ, এবং সেই চা-বাগান ও জনপদের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ জনের মধ্যে এক অনাবিল আধুনিকতার স্রোত ছিল। ডুয়ার্সের মেয়েরা ফুটবল, ক্রিকেট, খো খো... অর্থাৎ খেলাধুলোয় যথেষ্ট পারদর্শী, সঙ্গে পড়াশোনা বা গানবাজনার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট হয়েছে, হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, এইভাবে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে বা গিয়েছে, সেটা পারিবারিক বা সামাজিক সাপোর্ট না থাকলে সম্ভব ছিল কি? ছিল বলা বাহুল্য। সেই প্রাচীন ডুয়ার্সের কথা শুনেছিলাম। এক ঝড়ের দিনে দরজায় নক হতে দরজা খুলে এক পরিপাটি প্রৌঢ়াকে দেখলেন আমার ঠাকুমা। ঠাকুমার বর্ণনানুযায়ী— 'সাদা শাড়ি গুছিয়ে পরেছেন ভদ্রমহিলা। চিরুনির সরু দাঁত দিয়ে চুল টেনে খোঁপা বাঁধা। পায়ে সরু ফিতের চটি। এবং হাতে চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ! মুখে অল্প করে পাউডার মাখা। বড় বড় চোখ।' ঠাকুমা তখন বাড়িতে চটি পরেন না! চুল টেনে বিবিয়ানা দুরন্ত! বোনাস হচ্ছে হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ! বোঝাই যাচ্ছে বরিশাল জেলা থেকে আগত ঠাকুমা প্রথম দর্শনেই হতবাক। সেই মহিলা হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন— 'আমি হোসেনাবাদ চা-বাগানের হসপিটালের নার্স মৃণালিনী ঘোষদস্তিদার। আজ রোববার বলে এখানকার হাটে বাজার করতে এসেছিলাম। ঝড় উঠেছে দেখে একজন এই বাড়ি দেখিয়ে দাঁড়াতে বলল। আপনাদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, তাই একটু জানিয়ে রাখছি।'

এমন সুন্দর মার্জিত কথা শুনে ঠাকুমা যারপরনাই আহ্লাদিত। ঠাকুমার বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। বাড়িতে পড়াশোনার আবহ ছিলই। ঠাকুমা সে যুগেও যথেষ্ট পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু শহুরে মেজাজটা ছিল না বলে পরিপাটি সাজগোজের চল ছিল না। হয়ত 'বউ মানুষের এত সাজগোজ ভাল না' বলে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু মৃণালীনিকে দেখে মন প্রসন্ন হয়ে গেল— 'কেমন সুন্দর শিক্ষিত মহিলা'!

একজন মহিলার স্বশিক্ষিত হওয়া, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সসম্মানে সংসারের চালিকাশক্তি হওয়া... আমার হোমমেকার ঠাকুমার খুব পছন্দ হয়েছিল— 'বাড়িতে এই ধরনের বউ থাকলে বাচ্চারা শিক্ষিত হয়'। মহাশক্তির রূপের শেষ নেই। সে সংসারের দেখাশোনা করতে পারে, বাইরেও চলতে জানে। ডুয়ার্সের প্রায় ঘরে প্রচুর মহিলা চাকুরিজীবী রয়েছেন। পাশাপাশি রয়েছেন হাউসওয়াইফ। কেউ কারও পথের অন্তরায় হয়েছেন বলে দেখিনি। যদি হয়েও থাকেন, সেটা অন্য কারণে। কিন্তু কেউ স্বনির্ভর, কেউ নন বলে নয়।

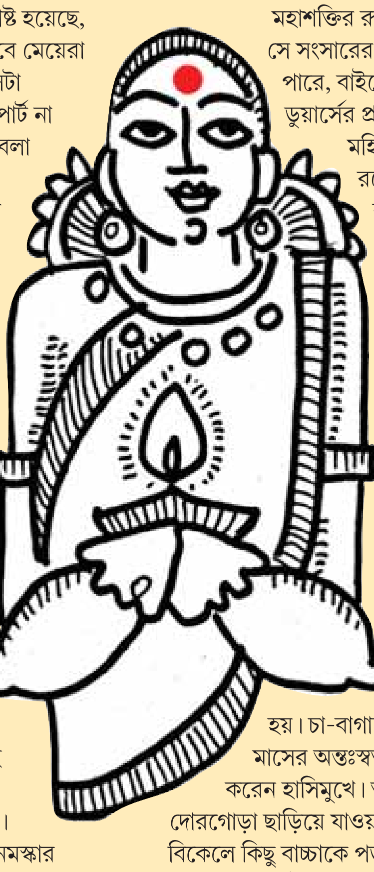

সেই গানটির কথা ডুয়ার্সের নারীদের দেখলে মনে হয়। চা-বাগানের শ্রমিক সাত মাসের অন্তঃস্বত্বা নির্বিবাদে কাজ করেন হাসিমুখে। আবার প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়া ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় মনে হল বিকেলে কিছু বাচ্চাকে পড়া দেখিয়ে দিলে কেমন হয়? সেই গানটির মর্মার্থ খুব বুঝেছেন ডুয়ার্সের মহিলারা। না হলে সংসারে সাফল্য আসে কী করে! মাগো, আনন্দময়ী, নিরানন্দ করো না...!

সাগরিকা রায়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পাতায় বছর দুয়েক আগে শুরু হয়েছিল 'শ্রীমতি ডুয়ার্স' বিভাগ। প্রান্তিক শ্রীমতিদের কর্মকাণ্ড ও কৃতিত্বের কাহিনি, তাঁদের ভাবনা চিন্তা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে এই বিভাগে। বলাই বাহুল্য, জনপ্রিয় হতে বেশি সময় লাগেনি। আর সেই জনপ্রিয়তার প্রথম ধাপ হিসেবেই 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৬, যে দিনটিতে জন্মেছিলেন ইতিহাসের দুই মহীয়সী নারী— ঝাঁসির রানি লক্ষীবাঈ ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

গোড়া থেকেই এই ক্লাবের উদ্দেশ্য একটি স্বচ্ছ ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে— গতানুগতিক জীবনের বাইরে নিজেকে সজীব সচল রাখা। শ্রীমতিদের প্রত্যেকের মনের কোণেই লুকিয়ে থাকে একেকটি স্বপ্ন। কেউ একদিন হয়ত চেয়েছিল নিজের গানের অ্যালবাম বের হোক, কেউ চেয়েছিল মঞ্চ কাঁপাতে, কেউ চেয়েছিল নিজের লেখা বই বের করতে, আবার কেউ বা ফ্যাশন ডিজাইনার-ফোটোগ্রাফার-পেইন্টার হতে। সংসার নামক গোলকধাঁধায় সেসব স্বপ্ন হয়ত নিচে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু কোনওটাই হারিয়ে যায় না। কেউ হয়ত আবার কিছুই হতে চায়নি, চেয়েছিল কেবল মন খুলে আড্ডা দিতে। সামান্য সুযোগ বা উৎসাহ পেলেই নিজেদের এই সব শখ বা প্যাশনকে আবার ঝালিয়ে দেখতে প্রয়োজন ছিল এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে কোনও কমিটি-লবি-প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি নেই, যেখানে সবাই একসঙ্গে বসে একে অন্যের কথা শুনতে পারে, শোনাতে পারে। নিয়মিত আড্ডা ছাড়াও 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব'-এর কর্মসূচিতে রয়েছে নানা সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও ফেস্টিভালের সক্রিয় অংশগ্রহণ, বইমেলায় স্টল পরিচালনা ইত্যাদি।

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক হলেই শ্রীমতিরা ক্লাবের সদস্য হতে পারবেন, আলাদা করে কোনও চাঁদা দিতে হয় না। যদিও 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব' কোনওভাবেই 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার অধীনস্থ কোনও সংগঠন নয়। নিজেদের আড্ডা, চা-টা, যাতায়াত, অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন ও প্রয়োজনীয় খরচ নিজেদেরই বহন করতে হয়। শ্রীমতিদের নিজস্ব এই প্ল্যাটফর্মে যদি মনে হয় নিজেকে কোথাও জায়গা করে দিতে পারেন বা নিজেকে কাজে লাগাতে পারেন, তবে আজই যোগ দিন শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব-এ। অন্য কারুর জন্য নয়, একেবারে নিজের স্বার্থেই।

সম্পাদক, এখন ডুয়ার্স

ছেলে বেলা ফিরে ফিরে আসে শাওনের সাথে

আজ সারাদিন ধরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে। নিজ কর্তব্যে কোনওরকম গাফিলতি নেই বরুণদেবের। আপন পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণের মাধ্যমে। অক্লান্ত পরিশ্রমেও বুঝি বিন্দুমাত্র প্রান্ত নন তিনি।

এক মাসের বেশি সময় হল আমি পা ভেঙে বাড়িতে পড়ে আছি। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু মন যেন আর মানছে না। চার দেওয়ালের মধ্যে ক্রমাগত আবদ্ধ জীবন মনটাকেও ক্রমে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। কতদিন ধরে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আলাপচারিতা হয় না। ঘরে আর যেন মন টিকছে না। ক্রাচটা হাতে নিয়ে জানালার পাশে এসে বসলাম, একটু বৃষ্টি দেখব বলে। আজ কেন জানি গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে আমার মন। মনে হচ্ছে চিৎকার করে কেঁদে উঠি; যেমন করে কেঁদে চলেছে আজ আকাশ আর প্রকৃতি। নিজেকে সংযত করে রাখার চেষ্টা করলাম তবু দু ফোঁটা জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। পাছে ওরা সবাই দেখে ফেলে এই ভয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটু বৃষ্টির জল ছিটিয়ে দিলাম আমার চোখে মুখে। অমনি চিৎকার করে

উঠল আমার অভিভাবক, 'মা! তোমার কিন্তু এবার আবার ঠান্ডা লেগে যাবে।' আমার মেয়ে, আজকাল ওই আমার আভিভাবক।

আজ অনেক কথা মনের মাঝে ভীড় করে আসছে। হয়ত শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও গত একমাস ধরে অলস হয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম, আজকাল বড্ড নিজেকে আর নিজের সংসারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। দায়দায়িত্ব, কর্তব্য, সংসারের বন্ধন— এসব নিয়েই এখন পরিব্যাপ্ত আমার জীবন। কখনও সংসারের কাজে, কখনও নিজের কাজে, কখনও বা নিছক দায়িত্ব পালনের তাগিদে— ছুটে বেড়াই সারাদিন। কত বছর হয়ে গেল জানালা দিয়ে আকাশ দেখি না। রাস্তায় বৃষ্টির জমা জল দেখি না। কিংবা নালাগুলো জলে ভরে উঠলে কাগজের নৌকো বানিয়েও ছাড়ি না। প্রকৃতির সঙ্গে গল্প করি না কতদিন। অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি জীবন থেকে।

আজ মনের মণিকোঠায় জমে থাকা ছেলেবেলার অনেক কথা উঁকি ঝুঁকি মারছে। ছোটোবেলায় আমি আর আমার দাদা একই ঘরে পড়তে বসতাম। ছোটোবেলা থেকেই দাদা পড়াশোনাতে খুব ভাল ছিল। ভীষণ রকমের পরিপাটি গোছানো মানুষ আমার দাদা। আর আমি ছিলাম একদম উল্টো মেরুর, পড়াশোনাতে একদম মন নেই। আমার শরীর-মন, সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু প্রেম আর প্রেম— গান, কবিতা, আকাশ, বৃষ্টি, উন্মুক্ত প্রকৃতি; সবার সঙ্গে সারাদিন ধরে চলত আমার প্রেম আর খুনসুটি। প্রকৃতির প্রেমে হারিয়ে যেত আমার সবটুকু। হারিয়ে যেতাম আমি— 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা.... মনে মনে'।

আজ খুব ইচ্ছে করছিল বাড়ির সামনের ড্রেন/নালাটা জলে ভরে গিয়েছে কিনা দেখবার। ক্রাচটা হাতে নিয়ে একটু এগতেই আবার আমার অভিভাবিকার কড়া শাসন, মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মা। এরকম করলে তোমার পা কিন্তু জীবনেও ঠিক হবে না।' মেয়ের এমন কড়া শাসন আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগে। ছোটোবেলার মায়ের শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। একটু মুচকি হেসে গ্রিলের পাশে এসে দাঁড়ালাম, দেখি সত্যিই ড্রেন উপচে জল রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করে যেন মনটা ভাল হয়ে গেল। ছেলেবেলার কিছু সুখস্মৃতি জলছবির

মতো ভেসে এল মনের মধ্যে। ছোটোবেলায় যখন বৃষ্টির জলে ড্রেন ভরে যেত; দাদা দুটো কাগজের নৌকো বানিয়ে বলত, 'নে, একটা তোর, আর একটা আমার। কারটা বেশি দূরে যায় দেখব।' খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠত আমার মন। দু'জনে আলতো করে নৌকো ভাসিয়ে দিতাম আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম কারটা কত বেশি দূর যায়। দেখতাম, ধীরে ধীরে নৌকো দুটো ছোটো ছোটো ঢেউগুলোকে অতিক্রম করে হেলে দুলে এগিয়ে যেতে। কখনও কখনও দাদা বলত, 'ওই দ্যাখ! তোর নৌকো খড়কুটোতে আটকে গিয়েছে; আমারটা কেমন এগিয়ে চলছে।' বিষণ্ণতায় ভরে যেত আমার মন, রা থাকত না মুখে, শুধু চোখ দুটো জলে ভরে উঠত। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই দাদা বলে উঠত, 'আরে দূর বোকা; তোরটাই তো যাচ্ছে, আমার নৌকোটা থেমে গিয়েছে'।

—দাদা! দেখ দেখ; আমার নৌকোটা থেমে গিয়েছে।

'মা! কী চিৎকার করছ? কিসের নৌকো? কে থেমে গিয়েছে?' সহসা মেয়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরল। চোখের সামনে যেন দেখতে

পাচ্ছিলাম সাদা দুটো নৌকো ভেসে যাচ্ছে।

ছোটো ছোটো সেই আনন্দ, সেই চাওয়াপাওয়াগুলো আজ আর নেই। এখন জীবন ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। জানি, ছেলেবেলার সেই দিনগুলো আর ফিরবে না। তবে স্মৃতিগুলো কিন্তু থাকবে মনের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য। আজ শ্রাবণের অবিরাম বারি ধারা ধুয়ে নিয়ে যাক আমার সমস্ত গ্লানি, মলিনতা, স্থবিরতা, অক্ষমতা, ব্যর্থতার যন্ত্রণা— ভেসে থাক শুধু স্মৃতি পটে আঁকা কিছু সুখস্মৃতির জলছবি।

সীমা চৌধুরী

নাম কীর্তন

লোকে বলে নামে কি এসে যায়? না মশাই, মোটেই তা নয়। নামে অনেক কিছুই এসে যায়। আর এসে যায় বলেই আদরে আহ্লাদে ব্যঙ্গে আসল নামটির কত শত ভগ্নাংশ আমরা করি বলুন তো?

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলে, তবু সে ছেলে জাতে ওঠে। আবার মালবিকা অপভ্রংশের কারণে 'মালবী' পর্যন্ত ভালই! কিন্তু তা ভেঙে 'মোলো' বললে তা 'মাল' হতে আর কতক্ষণ?

ছেলে হয়েছে। প্রথম সন্তান। মা আদর করে বলে আমার 'পুচু', বাবা ডাকে পুকুটা। তারপর কী করে একদিন 'পুচু' আর 'পুকু' থেকে 'চু' আর 'কু' উবে গিয়ে ছেলের নাম হল 'পু'। আর পাড়ার দুষ্টু ছেলের দল কি এই সুযোগ ছাড়ে? মুখে হাত দিয়ে বাঁশি বাজানোর মতো করে ডাকে পুউউউ— পুউউউ— বাড়িতে এসে সেই ছেলের কী কান্না! কেন এমন নাম দিলে? ঠাকুমা সান্তনার সুরে বলে 'অ-পু' কাঁদে না'! আর ঠাকুমার সেই 'অ-পু' 'অ-পু' ডাক কবে যেন হয়ে গেল অপু। ছেলে বেঁচে গেল। আজ সেই ছেলে সবার প্রিয় 'অপুদা'। কান্ডই বটে!

ছাপোষা বাপের ছেলে শহরের নামজাদা কলেজে পড়ে। তো, বাবা কী এক কারণে কলেজে গিয়ে ক্যাম্পাসে ছেলেমেয়েদের অনির্বাণ মুখার্জিকে ডেকে দিতে বলে। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তারা বলে 'ওনিরবান—ওনিরবান! তারপর বুঝতে পেরে একজনকে ডেকে বলে 'এই ব্রো! কল অ্যানি প্লিজ'। বাবা তো থ। নামের এই ট্যাশ উচ্চারণের নমুনা বড় কম না। অনুষ্কা হয়ে যায় আনুষ্কা, পল্লবী পরিণত হয় প্যাল্লাবিতে, সমীরণ স্যামি— বিজাতীয় উচ্চারণ কী স্মার্ট!

আধুনিক বাঙালি বাবা-মা-রা তো আর এক কাঠি সরেস ছেলের ডাক নাম 'সূর্য' আর ভাল নাম 'আরিয়ান'। মা শাহরুখ ফ্যান আর শাহরুখের ছেলের নাম 'আরিয়ান'। ধর্ম নিরপেক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন। ছেলে বা মেয়ে যেই হোক এমন একটা নাম চাই— যা আজ পর্যন্ত কারও হয়নি। জাস্ট আনকমন! তাই চারটে অভিধান ঘেঁটে, দু'জন সাহিত্যিকের মেধা মুড়িয়ে খোঁজ খোঁজ রব। —হ্যাঁ, পাওয়া গিয়েছে। 'সৌকর্য'— যার অর্থ ব্যবহারযোগ্য। কোন কাজে ব্যবহার হবে তা ঈশ্বরই জানেন। এবার সেই 'সৌকর্য' স্কুলে এসে বানান বিভ্রাটে হল 'শৌকর্য'। হল তো হল। তাকে কী! না, কিছুই হয়নি— তবে মানেটা বদলে গিয়েছে। এই 'শৌকর্য'-এর অর্থ শূকরত্ব, মানে অমুকের বাচ্চা। বুঝুন ঠ্যালা!

কিন্তু আমি কেন এই নামকীর্তন নিয়ে হেদিয়ে মরছি? কারণ আমার নামেরও পোস্টমর্টেম হয়েছে। শোনা কথা, জন্মের সময় না কি এত সুন্দর, এত ফুটফুটে হয়েছিলাম যে ডাক্তারবাবু নিজে নাম দিয়েছিলেন— 'ডালিয়া'। আর স্নেহ সততই অধোগতি— তাই মা-বাবা ডালিয়াকে কেটে ছেঁটে 'ডালি' ডাল ইত্যাদিতে নিয়ে এলেন। আবার ইস্কুলে 'ডালিয়া বড়ুয়া' হল 'ডালবড়া'। বন্ধুদের মজা আর কী! আর মেয়ের ঘরের বড় নাতনি হিসেবে মামাদের আদরে হলাম 'ডেলো'।

আমার নামটা আমার মোটেই পছন্দের ছিল না। নিজে নিজেই বদলাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে হ্যাপা পোষাল না। আশা ছিল, বিবাহ পরবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটা পছন্দসই নাম পাব। যেমন অনেকেই পায়। কিন্তু আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। তাই এ পর্যন্ত আমার নশ্বর দেহে, আমার সত্ত্বায় ডালিয়া ফুলকে নিয়ে ফুল ফর্মে ব্যাটিং করে অর্ধশতক পার করে দিলাম! এখন বুঝলেন তো? নামেও এসে যায়!

ডালিয়া চৌধুরী

শ্রীমতি শতাব্দী এক্সপ্রেস

আজ এমন একজন আশ্চর্য মানুষের কথা লিখব বলেই কাগজকলম নিয়ে বসেছি। শতাব্দী প্রাচীন এই মানুষটি মাল শহরের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী। মাল শহরের ১ নং ওয়ার্ডের আদর্শ কলোনীতে এই মানুষটির বাস। যার বিষয়ে আমি লিখছি, তার নাম 'মধুবালা বসাক'। ছোটখাট চেহারা, সাদা থান পরিহিতা, গলায় তুলসীর মালা কয়েকটি সোনার পুতি দিয়ে গাঁথা। দাঁত বিহীন মুখখানিতে সবসময় হাসি লেগেই আছে।

মাল শহরের প্রায় প্রতিটি কলোনী এবং সুভাষিণী বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণি এবং প্রতিটি ছাত্রীর কাছে উনি খুবই পরিচিত।

তিন-চার বছর আগে পর্যন্ত উনি নিজের হাতের তৈরি ডালের বড়ি, ছাতু, মোয়া, মুড়কি, চিড়ে ভাজা, চাল ভাজা, নিমকি, খুরমা, অমৃত্তি, রসগোল্লা এমনকি রসমালাই বানিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রী করে নিজের জীবিকা নিজেই চালাতেন। প্রতিটি কলোনীর প্রায় প্রতিটি বাড়ি এবং সুভাষিণী স্কুলের দিদিমণি এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে ওঁর সুস্বাদু খাবার আর মিষ্টি ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

এই খাবারের সুবাদেই আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয়। কেন জানি না ওঁর সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমাকে উনি বৌমা বলে ডাকতেন, আমার ছেলেমেয়েদের খুব ভাল বাসতেন, নতুন কোনও খাবার বানালে আগে আমাদের দিতে আসতেন। যদি কোনও রকম দরকার বা অসুবিধা হত উনি আমাকে এসে বলতেন। উনি এখন আর বেশি হাঁটাচলা করতে পারেন না। আমি মাসিমা বলে ডাকতাম। মাসিমার পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে, এখন এক ছেলের কাছেই থাকেন। নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিজেই করেন, আর অবসর সময়ে ছেলের দোকানে তদারকি করেন।

ওঁর কথা লিখছি তার একটাই কারণ, এই মাসিমার বয়স একশো ছয়-সাত বছর, এই বয়সেও উনি হেঁটেচলে বেড়ান, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি এখনও বয়স অনুপাতে বেশ ধারাল। বেশ কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে ফোকলা গালে মিষ্টি হেসে বললেন, 'বৌমা ভাল আছ?'

উমা দত্ত

সফল শ্রীমতি উদ্যোগী চায় না কলকাতার তকমা

আচ্ছা একটা কথা মানবেন তো, আমরা বেশির ভাগ মায়েরাই তো বাচ্চাদের অনেকরকম এক্সট্রা কারিকুলার বিদ্যে শেখানোর চেষ্টা করি! যেমন ওদের ড্রয়িং শেখাই যাতে উঁচু ক্লাসে উঠে বায়োলজির খাতায় ব্যাং-আরশোলা-টিকটিকি ঠিকঠাক আঁকতে পারে, তাই না? আবার মেয়েদের যেমন গান শেখানো হয় পাড়ার প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়ে বাড়ির আলমারি সাজাতে আর বিয়ের বাজারে যোগ্যতা বাড়াতে, ঠিক কি না বলুন? কিন্তু আমায় বোঝান তো ভাই, এই আবৃত্তি শিখে লাভটা ঠিক কী হয়? আপনার সন্তানকে কি কেবল প্রাইজ জেতাতে মাসে অ্যাতোগুলো করে টাকা খচ্চা করেন? নাকি ওকে বড় আবৃত্তিকার বানাতে চান? ও ভুল হল, এখন তো আর আবৃত্তিকার বলে না, এখন তো বলে বাচিকশিল্পী! সে যাই বলুন গে, আসা যাওয়ার পথে এই আবৃত্তির ইস্কুলে অ্যাত্তো ছেলেমেয়ের ভিড় দেখি আর আমার মনে সেই এক প্রশ্ন বারবার আসে!

যাঁকে এই প্রশ্ন করা হল তিনি দেখলাম মিচকি হেসে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন দিদিভাই, আমিও কিন্তু আবৃত্তির স্কুলটায় ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কমবার কোনও লক্ষণ দেখতে পাই না! আসলে আমার সবার আগে যেটা মনে হয়, আবৃত্তি ক্লাসে বাচ্চাদের প্রাথমিক জড়তাটা কেটে যায়, একটা স্মার্টনেস আসে। তারপর উচ্চারণে স্পষ্টতা তৈরি হয়, যার ফলে ছোট বয়স থেকেই ভেতরে আত্মবিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে। আধুনিক গতিশীল দুনিয়ায় খেলার মাঠগুলি তো সব হারিয়ে গেছে, নিউক্লিয়াস পরিবারে একা একা বেড়ে ওঠা ক্লাসের ইঁদুর দৌড়ে আর পিঠে বইয়ের বোঝায় ক্লান্ত আজকের শিশু নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে থাকে। বাবা মায়েরা বাচ্চাদের এই কুঁকড়ে যাওয়া নীরবতায় শংকিত হয়ে পড়েন। সেসব কারণেই মনে হয় এই আবৃত্তির স্কুলে ভীড় এত বেশি!

চায়না চট্টোপাধ্যায়

যাঁর স্কুল ঘিরে এই বাক্য বিনিময় ও ব্যাখ্যার আদানপ্রদান, তিনি কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করেন, শব্দই ঈশ্বর, শব্দের অসীম ক্ষমতা। শব্দের উচ্চারণ ভেদে মানুষে মানুষের সম্পর্কে যেমন আকাশপাতাল তফাৎ ঘটে যেতে পারে, তেমনি শব্দের সঠিক উচ্চারণে আত্মার বিকাশ ঘটা সম্ভব। পুরাণে যেমন দেখা যায়, মুনিঋষিদের মন্ত্রোচ্চারণের জোরে দেবতারা পর্যন্ত মর্তে নেমে আসতেন, তাঁদের মুখনিসৃত অভিশাপ উচ্চারণে ভয় পেত সাধারণ মানুষ, কারণ তা ছিল অবধারিত, আবার তাঁদের আশীর্বাদ মন্ত্রে মৃত মানুষও বেঁচে উঠত। তেমনই এই ঘোর কলিযুগেও সঠিক উচ্চারণে কোনও সু-কবিতা আবৃত্তিরও সুদূর প্রসারী প্রভাব থাকতে বাধ্য। ঠিক এই কারণেই বোধহয় এইরকম একটা আবৃত্তির স্কুলে ভীড় জমা অতি স্বাভাবিক। আর যাঁর মন্ত্রগুপ্তি বা প্রশিক্ষণ পেতে এই ভিড় সেই মানুষটি হলেন শ্রীমতি চায়না চট্টোপাধ্যায়।

গত সাতাশ বছর ধরে চায়না তাঁর ছন্দ-যতি আবৃত্তি সংস্থা চালিয়ে আসছেন। রবি থেকে শনি সাতদিনই ক্লাস, আলাদা করে ছুটির দিন মেলে না তাঁর। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাড়ে তিনশো-র কাছাকাছি। অথচ ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটা এত সহজ ছিল না, আর সাতাশ বছরের সফরটাও কম লম্বা নয়। কারণ জায়গাটার নাম কোচবিহার। দুই বাংলার প্রত্যন্ত এই সীমান্তে সাতাশ বছর আগে কলকাতার খবরের কাগজ এসে পৌঁছত দেড়-দু'দিন বাদে, টিভিতে বাংলাদেশ বা দিল্লি। স্থানীয় মানুষের মতে, এই সাতাশ বছরে কোচবিহার এগয় নি, বরং রাজনীতির উইপোকা গত তিন দশকে খেয়ে ফেলেছে এখানকার সাংস্কৃতিক বনেদিয়ানাকে। সব হারিয়ে অগত্যা কোচবিহারের মানুষ কেবল আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাইছে হারাধনের সেই এক হারিয়ে যেতে বসা রাজঐতিহ্য। এই করুণ পরিবেশেও কিন্তু খুব একটা ঘাবড়ে যান নি চায়না। চলতি দুনিয়ার যাবতীয়

দেখনদারি থেকে পিঠ ফিরিয়ে স্বশিক্ষিত এই শিল্পী একাগ্র সাধনার মতই ভালবাসা ও জীবিকাকে একসুতোয় গেঁথে চালিয়ে গিয়েছেন তাঁর ছন্দ-যতি। তাই সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনার যুগেও চায়নার এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কথা চট করে অস্বীকার করতে পারে না কোচবিহারের কোনও পরশ্রীকাতর মানুষও।

সেই ছোট্টবেলা থেকে দিদিদের কাছে ছন্দের তালিম, কলেজ ছাড়ার আগেই পাড়ায় মাচা বেঁধে অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, তারপর স্যান্যাল বৌদির বড় বারান্দায় পাঁচজনকে নিয়ে ক্লাস শুরুর মধ্য দিয়েই সূচনা হয়েছিল ছন্দ-যতি-র। দু' বছর আগে মহা ধূমধামে তার রজত জয়ন্তী পালনের স্মরণিকায় সেসবই স্মৃতিচারণ করেছেন চায়না। এখন তাঁর ছাত্রছাত্রীর বয়স আড়াই থেকে সত্তর অব্দি। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের আধো আধো উচ্চারণ তাঁকে যেমন এনার্জি জোগায়, তেমনই মানসিক প্রতিবন্ধীরা তাঁকেই সাহারা বা বন্ধু হিসেবে আঁকড়ে ধরে। তোতলামি সারানোয় চায়নার সরল উচ্চারণ থেরাপি জাদুমন্ত্রের মতই কার্যকরী। চায়নার কাছেই জানা গেল, কেবল উচ্চারণই নয়, তাঁর ছাত্রছাত্রীরা কবিতা আবৃত্তি শেখার সুফল পায় বাংলা পরীক্ষার খাতায় কবিতার লাইনের সঠিক ব্যবহারেও।

ব্যক্তিত্বময়ী এই শিল্পীর মঞ্চানুষ্ঠানও বারবার মুগ্ধ করেছে কলকাতা তথা বাংলার নানা প্রান্তের দর্শক শ্রোতাকে, যদিও এখন কোচবিহার ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সময় সুযোগ মেলে কম। শিল্পীর এক শুভানুধ্যায়ীর কথায়, উত্তরবঙ্গে যে কোনও ক্ষেত্রেই কলকাতার ছাপ্পা থাকলে কদর ও গ্ল্যামার দুইই বেড়ে যায় বেশ কয়েক গুণ, অথচ সে সুযোগ চায়না হেলায় ছেড়ে দিয়েছেন বারবার। কারণ শিল্পী জীবনের রূঢ় অনিশ্চিত দিনগুলির সম্মুখীন হতে চান নি তিনি। তাই আজ অনেক বেশি ব্যস্ত থাকেন নতুনদের প্রস্তুতিতে। শিশুদিবসে ছন্দ-যতির অভিনব অনুষ্ঠান দেখে মনে হতেই পারে এটি আগামী প্রজন্মের প্রতি তাঁর কমিটমেন্টের একটি ছোট্ট নমুনা। শিল্পী জীবনভর তাঁর নিজের সৌরভ ছড়াতেই ব্যস্ত থাকবেন, অথচ পরবর্তী প্রজন্মে তা প্রবাহিত হবে না, এই থিয়োরিতে সম্ভবত বিশ্বাস করেন নি চায়ন। এই বাস্তব ভাবনাই তাঁকে সুস্থ সংস্কৃতির সফল উদ্যোগপতি বানিয়েছে, যা উত্তরবঙ্গে বিরল। জীবনসঙ্গী বাবুলকে সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন তিনি, তাই কোনও বিরূপতার পরোয়া করেন না। শ্রীমতি ডুয়ার্সের পাতায় চায়না চট্টোপাধ্যায়ের সাফল্যের এই কাহিনি হাজির করতে দু' বছর লেগে গেল কেন সেই আক্ষেপ কিন্তু থেকেই গেল!

নিজস্ব প্রতিবেদন

শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব

দেখতে দেখতে একটা বছর

'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব' যে কবে একবছর পেরিয়ে গেল নিজেরাও টের পাইনি আমরা বুদ্ধদেব গুহ বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় প্রত্যেক বিবাহিত মেয়েরই একটি খোলা বারান্দার প্রয়োজন আছে ও থাকে— যেখানে সে তার স্বামী সংসারের আবর্তে হাঁফিয়ে উঠে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে এসে। সেই খোলা হাওয়ায় নিজেকে পুনরুজ্জিবীত করে আবার বদ্ধ ঘরে ফিরে যেতে পারে। ঘর যতখানি সত্য বারান্দাও ততখানিই সত্য। যদি কোনও নারী বলেন যে, তার মনকে তিনি ঘরের মধ্যেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন চিরদিন তাহলে হয় তিনি সত্যি কথা বলেন না, নয়ত তিনি আত্ম-বঞ্চনাতে বিশ্বাস করেন।' আহা! এর চাইতে সত্যকথন নারীদের জন্য কি হতে পারে!

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা নিয়ে কাজ করার সুবাদে আমাদের বাড়তি পাওনা এই 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব'। ডুয়ার্সের বিভিন্ন মহিলাদের দৈনন্দিন চলার পথের সংগ্রামকে তুলে ধরার একটা সুযোগ যখন হাতে এল তখন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে শুরু করলম আমি। মহিলা মাঝি থেকে আরম্ভ করে লেভেল ক্রসিং-এ কর্মরত মেয়ে, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কারপ্রাপ্ত বিউটি কুইনও ধরা পড়েছেন আমাদের 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায়। স্কুল শিক্ষিকাও যেমন রয়েছেন তেমনই রয়েছেন কবি-সাহিত্যিক, নৃত্য ও সংগীত শিল্পীও। রয়েছেন রাজনৈতিক নেত্রীও। মহিলাদের এত কর্মকান্ডের পাশাপাশি তাঁদের সংসারের

শ্যামাপুজোর সেরা মুখ

গত ৫ নভেম্বর রবিবার জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল 'শ্যামাপুজোর সেরা মুখ সেলফি প্রতিযোগিতা'-র গ্র্যান্ড ফিনালে। 'আবার খাবো'-র অন্যতম কর্ণধার লুইদা সকলকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য। বিজয়ীরা হলেন— প্রথম সাবিনা সুলতানা, দ্বিতীয় রিয়া চক্রবর্তী ও তৃতীয় শ্রেয়সী ভৌমিক (দত্ত)। সঙ্গের ছবিটি প্রথম স্থানাধিকারী সাবিনা সুলতানার।

প্রতিদিনকার কাজকর্মও কিন্তু চলে সমান তালে। কী করে সামলান তাঁরা? কে জানে! অবাক লেগেছে ভাবতে। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় একদিন হঠাৎই মনে হল ওই 'খোলা বারান্দার' কথা। এরকম একটা বারান্দার খুব প্রয়োজন মেয়েদের যেখানে শুধুই হাসি-ঠাট্টা-বিনোদন আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা টুকরো টুকরো প্রতিভাগুলো এইবার অন্তত জেগে উঠতে পারে। তানপুরায় ধুলো জমেছে কারুর, ঘুঙুর পড়ে আছে অচৈতন্য অবস্থায় সিন্দুকের কালো অন্ধকারে, আবৃত্তির বইগুলো শেল্ফের এক কোণে বড় অবহেলায় তার প্রিয়জন হারিয়ে...। একে একে জড়ো হতে লাগলেন সবাই।

জলপাইগুড়ির মুক্তাভবনের দোতলায় আড্ডাঘরে প্রথম জমায়েত হওয়া গেল ১৯

নভেম্বর ২০১৬-র এক বিকেলে। সেদিন একটি ফেসবুক পেজও উদ্বোধন করা হল 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব', এই নামে। সেদিন সকলেই উৎসাহিত হয়ে মনেপ্রাণে জড়িয়ে পড়লেন ক্লাবের সদস্য হিসেবে। শুরু হল আমাদের প্রতি মাসে দু'বার করে মন খুলে আনন্দ করার, বারান্দায় এসে দাঁড়ানো। একটু মুক্ত বাতাস বুক ভরে টেনে নিয়ে আবার দু'সপ্তাহ যে যার গণ্ডির ভেতর ফিরে যাওয়া। খবর পাওয়া গেল একটি ছোট ছেলে ক্যান্সারে আক্রান্ত। তার দুঃখী বাবা-মাকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে তৎপরতা দেখা দিয়েছিল। আমরাও আমাদের সীমিত সামর্থে একটুখানি আর্থিক সাহায্যসহ শুভেচ্ছা পাঠালাম ওকে। শেষমেশ অবশ্য তাকে বাঁচানো যায়নি তবু তার বাবা-মায়ের পাশে সামান্যতম সাহায্য নিয়ে দাঁড়াতে পেরে আমরা তৃপ্ত হয়েছি অনেকটাই।

চলে গেলাম বাতাবাড়ির একটি রিসর্টে পিকনিক করতে। সে কী আনন্দ সকলের! জনা কুড়ি 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব' সদস্যের উচ্ছ্বাসে হেসে উঠেছিল ডুয়ার্সের পাখিরাও। গান-নাচ-খাওয়াদাওয়া করে সন্ধেবেলা যখন ফিরলাম তখন কেবল মনে হচ্ছিল আমরা যেন একই পরিবারের আপনারজন।

১লা বৈশাখে নতুন জামা-কাপড়ের দোকানগুলো উপচে পড়ে ভিড়ে পাশাপাশি জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুগুলোর মুখ দেখলে বুকের ভেতর বেদনা জাগে এই আনন্দের দিনগুলোতে। সদস্যদের প্রত্যেকের ভেতরেই তো 'মা' লুকিয়ে আছে, তাই ইচ্ছে হল ওদের জন্য একটু যদি হাসি নিয়ে যেতে পারি আমরা। শহরের লাগোয়া 'নিজলয় হোম'-এর আবাসিক মেয়েদের জন্য ছোট ছোট উপহার নিয়ে একটু আনন্দ বিনিময় করে এল 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব' সদস্যরা।

মালবাজার থেকে ছুটে এসেছেন মীনাক্ষী ঘোষ। প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাদের জলপাইগুড়ি ক্লাবের সদস্য। নিজে এতটাই উৎসাহী হলেন যে নিজের শহরে একটি শাখা খুলে ফেললেন তিনি। জনা তিরিশেক সদস্য নিয়ে মালবাজারেও শুরু হয়ে গেল 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব', মালবাজার শাখা। তাঁরা তাঁদের মতো করে নানান কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ক্লাবটি।

কোচবিহারেও তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস ও বহ্নিলেখা তালুকদারের প্রেরণায় এবং 'এখন ডুয়ার্স'-এর সহযোগিতায় উদ্বোধন হল 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব', কোচবিহার শাখা। তাঁরাও তাঁদের সুবিধে মতো একসঙ্গে বসে নিজস্ব শাখাটির শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টায় প্রতিনিয়ত সদাসতর্ক।

আসলে, প্রকৃতপক্ষেই এটি এমন একটি ক্লাব যেখানে দেনাপাওনার ভাবনা নেই, শুধুই আনন্দ পাওয়া ও আনন্দ বিলিয়ে দেওয়া। মনের কত না বলা কথা উজাড় করে দেবার জায়গা। একসঙ্গে এত বন্ধু পাওয়া, যারা সমমনস্ক, এ তো সৌভাগ্যের কথা।

চা-বাগানের না খেতে পাওয়া না পরতে পারা গরীব দুঃখীদের জন্য পরণের বস্ত্র তুলে দিয়ে সাজু তালুকদারকে সাহায্য করেছেন শ্রীমতিরা। ইচ্ছে আছে ডুয়ার্স জুড়ে এমন একটি বন্ধন তৈরি হবে মহিলাদের যেটা হবে একটি পরিবারের মতো। এক ডাকে সবাই জানবে 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব'-এর নাম। আর আমরা যারা এই ক্লাবের সদস্য তাদের দায়িত্ব অনেক। নিজেদের প্রতিটি কর্মসূচি তৈরি করে একটি একটি করে পূরণ করে ডুয়ার্সের অপরূপ সৌন্দের্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুঃখ বঞ্চনার কথাও জানিয়ে যাব বলে যাব আর তা প্রতিকারের চেষ্টা চালিয়ে যাব আমরা। ডুয়ার্স আমাদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের মতো। ফলে তাকে ঘিরেই আমাদের চলার পথের গতি নির্ধারিত হয়। এত সবুজের মধ্যে আছি বলেই বোধহয় আঠারো থেকে আশি সবাই আমরা মনেপ্রাণে এত সবুজ।

শ্বেতা সরখেল

অধরা উত্তরা?

দীর্ঘ তিরিশ বছর কর্মসূত্রে কেটে গেল বাংলার উত্তরপ্রান্তে। কোচবিহার থেকে কালিম্পংয়ের নানা প্রান্তে, নির্ভেজাল গ্রামীণ পরিবেশ থেকে শুরু করে আধুনিকতার স্পর্শে সাজুগুজু শহুরে আবহাওয়া, সর্বত্রই গত তিন দশক ধরে অভিযোজন ধরা পড়েছে এই সাধারণ চোখে। বলাই বাহুল্য, এই লম্বা সফরে মেলামেশা আত্মীয়তা বন্ধুত্ব হয়েছে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষের সঙ্গে। তাদের অনেকেরই সঙ্গেই আবার যোগাযোগ ক্ষীণ হতে হতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে নারী হওয়ার সুবাদেই অনেকটা কাছাকাছি যেতে পেরেছি মহিলা মহলের। তাদের সুখদুঃখের ভাবনা-চিন্তার খোঁজ আলাদা করে না নিলেও তার কিঞ্চিৎ ছোঁয়া তো পেয়েইছি বরাবর।

তরাই-ডুয়ার্সের গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে মিশে যেটা অনুভব করেছি তা হল, গ্রামীণ নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারেন। পুরুষ শাসন মেনে নিতে অস্বীকার না করলেও সংসারে মাঠে-ঘাটে শ্রীমতিদের গুরুত্ব যে কোনও অংশেই কম নয় সেই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। পাহাড়ি সমাজের কথা ছেড়ে দিলেও সমতলের গ্রামেও নারীরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে নেই। শিক্ষায়-স্বাস্থে-পরিকাঠামোয় অভাব বা দারিদ্র্য কিংবা কোনও সামাজিক সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কখনই। স্বামী বা পুত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে দিন কাটান না গ্রামের মেয়েরা। মদ্যপ স্বামী বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে দু'ঘা লাগালে প্রত্যুত্তরে দু'ঘা দিতে কসুর করেন না তাঁরা। বসে বসে অশ্রুপাত যে সমস্যার সমাধান করতে পারে না সেই বাস্তব তাঁরা উপলব্ধি করেছেন অনেকদিন আগেই। অবশ্য তার অন্য ব্যাখ্যাও শুনেছি। উত্তরের জলহাওয়া নাকি আলস্যি আনে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সেই কারণে প্রজন্মের প্রজন্ম পুরুষেরা কর্মবিমুখতাই নাকি এখানকার নারীদের সামনে এগিয়ে আসতে সহায়ক হয়েছে।

সে যাই হোক, শহরের ছবিটা কিন্তু অদ্ভুতভাবে আলাদ ধরা পড়েছে, অন্তত আমার চোখে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি বা কোচবিহারের মতো শহরে শ্রীমতিরা দেখেছি

সবসময়েই কেমন যেন দ্বিধা বিভক্ত। এখানে চাকুরিরত মহিলা বলতে মূলত স্কুলশিক্ষিকা। তারপর সরকারি কর্মচারী। ব্যাঙ্ক বা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে বা বেসরকারি সেলসে কিংবা ব্যবসায় শ্রীমতিরা সংখ্যায় এখনও অনেক কম। যেখানেই হোক না, কেন, এখানকার কর্মজীবী মহিলাদের নিজেদের কাজের জায়গা তারপর কমবেশি ঘর গেরস্থালী সামলে অন্য জগতে দেওয়ার সময় বা মানসিকতা থাকে না বললেই চলে। যেটুকু বা থাকত আগে দেখেছি তা আজ টেলিভিশনের পর্দায় ব্যয় হয়।

অন্যদিকে যাদের জীবিকার জন্য বাইরে বেরোতে হয় না, সেই সব শহুরে গৃহিণী বা হোমমেকারদেরও দেখেছি নিজেদের জন্য আলাদা করে সময় বের করবার কথা ভাবেন না। এঁদের জগৎ তৈরি হয় ছেলেমেয়েদের স্কুল ঘিরে এবং তা স্কুলের সিলেবাস-পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এঁরা সিনেমায়, দোকানে, শপিং মলে, রেস্তরোঁয়, পিকনিকে কিংবা ছেলেমেয়েদের সহপাঠিদের জন্মদিনে একে অন্যের বাড়িতে যান, কখনও সপরিবারে, কখনও দলবেঁধে। কিন্তু যে কোনও পরিস্থিতিতেই এঁদের আলোচনার বিষয় কিন্তু থাকে সেই ছেলেমেয়েদের স্কুল ও সিলেবাসে। অনেকেরই লেখাপড়া বা গানবাজনার যথেষ্ট ডিগ্রি থাকে কিন্তু এঁরা কদাপি আড্ডায় বসলেও নিজেদের সমস্যা কিংবা নিজেদের পুরনো শখ বা ভালবাসার গল্প কখনও করেন না। সংসারের প্রতি এহেন নিবেদিত প্রাণের নারীরা রোজগেরে মহিলা সমাজ থেকে যতটা সম্ভব সাবধানী দূরত্ব বজায় রাখেন। কেবল তাই নয়, ব্যতিক্রমী বা উদ্যোগী বা খানিক ভিনচরিত্রের কোনও মহিলাকে আশপাশে দেখলেই এঁরা সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং সেই মহিলাটির কীর্তিকলাপ ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ও রসকাহিনি জারি রাখেন। রান্নাবান্না বা হেঁশেল সামলানো যে

এঁদের সবার ভাল লাগে তা জোর গলায় বলা যায় না, কিন্তু রান্নাঘরেই যে এঁদের জীবনের সেরা সময়টুকু চলে গেল একথা সুযোগ পেলেই জাহির করতে ভোলেন না। দেবদেবীর পুজো-মানত এঁদের মূল সংস্কৃতি, হনুমান চালিসা এঁদের নব্য বেদ, মেগাসিরিয়ালের চরিত্র এঁদের আদর্শ মানুষ। শাড়ি বা গয়নার মতোই এঁদের স্বামী বা 'বর'-রাও এঁদের অলংকার, প্রয়োজনে প্রদর্শন করেন। সারারাত শয্যা শেয়ার করলেও সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এই 'বর'-দের সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখেন না কেউ, বরদের মহিলা সহকর্মী বা বন্ধু থাকাটা ভয়ংকর 'ক্রাইম' বলেই গণ্য করেন এঁরা। তবে হ্যাঁ, অর্থ যোগানে, স্থানান্তরে গমনে কিংবা নেমন্তন্ন বাড়িতে এবং সম্ভবত নারীমুক্তির আন্দোলনের পথেও 'বর' ছাড়া ভাবতেই পারেন না এই সব পতিব্রতা নারীরা। এর বাইরে রয়েছেন সংস্কৃতি জগতের কতিপয় নারী, যাদের দেখেছি শতগুণের অধিকারিণী হয়েও মনটাকে প্রসারিত করতে পারেন না। সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে একের পর এক সংস্থা সংগঠন ঘুরে ঘুরে এঁরা সব একাকী নিঃসঙ্গ। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও জ্ঞান কেবল নিজের জন্যই, নাকি মানুষের মধ্যে নিঃশর্তে বিলোবার জন্য সে নিয়ে আজও ভীষণ বিভ্রান্ত এই সব বিদূষী গুণী মহিলারা। ফলে স্বভাবতই সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে সেই অবরুদ্ধ পিছিয়েই থেকে গেল ডুয়ার্স-তরাই।

এসবের ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে তো 'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব'-এর জন্ম হত না, জনপ্রিয় একটা বছর পেরতে পারত না! গত তিরিশ বছরে নিজেও এই ডুয়ার্স তরাইয়েরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছি নিজের অজান্তেই। নিজের চারিত্রিক বদল খুব টের পাই যখন কালেভদ্রে নিজেদের দেশ গাঁয়ে বেড়াতে যাই, আত্মীয় স্বজনের অবাক দৃষ্টিতে। খুব যে অস্বস্তি হয় তা কিন্তু নয়। কারণ এখন আমিও তো একজন শ্রীমতি উত্তরা।

শ্রীরূপা সেন

শ্রীমতী ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের ডিশ

কাবলি ছোলায় ডিম

বাঙালি মানেই উৎসব আর উৎসব মানেই ভূরিভোজ। সারা বছর যা-ই হোক না কেন, উৎসবের ক'দিন আমরা একটু অন্যরকম খেতেই পছন্দ করি। না, এই সময় কোনও ডায়েট চার্ট মানা যাবে না। সুগার-প্রেশার যা-ই থাক, নিয়ম মানব না। আজ আমি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, স্ন্যাক্স, ডিনার— অর্থাৎ গোটা একটা দিনের খাবারের চারটে রেসিপি দিলাম। পছন্দ হলে যে কোনও একদিন পরিবারের সকলকে রেঁধে খাওয়ান। যাকে খাওয়াবেন, সে-ও খুশি হবে আর আপনিও তৃপ্তির হাসি হাসবেন।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

উপকরণ: কাবলি ছোলা ২৫০ গ্রাম, ডিম ৫/৬টি, পেঁয়াজ কুচনো - বড় ২টি, আদাবাটা - ২ চা চামচ, রসুন বাটা - ২ চা চামচ, টম্যাটো বাটা ১টা বড়, লঙ্কা বাটা - স্বাদ মতো, কসুরী মেথি - ১ চা চামচ, টক দই আধ কাপ, লবণ, চিনি - স্বাদ অনুসারে, ফোরনের জন্য জিরা, তেজপাতা।

প্রণালী: কাবলি ছোলাকে সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন, তারপর লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। ডিমগুলি নরম করে সেদ্ধ করুন, এমনভাবে সেদ্ধ করবেন যাতে একদম শক্ত না হয়। কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে প্রথমে জিরে তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কা ফোরন দিন। তারপর পেঁয়াজ কুচিগুলি বাদামী করে ভেজে নিন, এরপর একে একে আদা-রসুন-টম্যাটো বাটা দিয়ে খুব ভাল করে কষিয়ে নেবেন। এরপর হলুদ-লঙ্কা ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে আবার ভাল করে কষিয়ে নিন, তারপর লবণ ও চিনি দিয়ে দিন ও কসুরি মেথী ও টক দই দিয়ে ভাল করে নেড়ে সেদ্ধ করা ডিমগুলি দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন ও গ্যাস বন্ধ করুন, ধনে পাতা দিয়ে সাজিয়ে রুটি-পরটা বা ফ্রাইড রাইস-পোলাও এর সঙ্গে পরিবেশন করুন, দারুণ খেতে লাগবে।

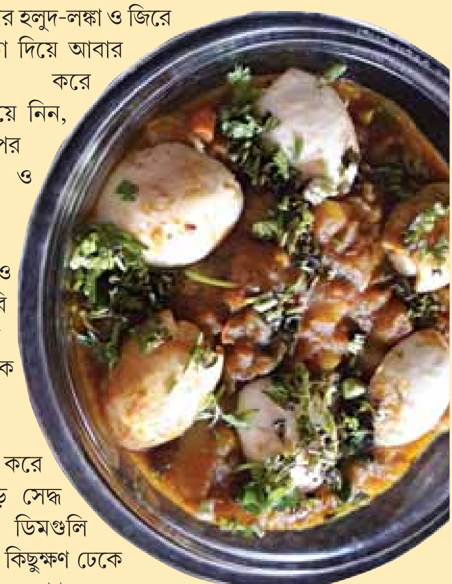

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

"মৃত্তিকা কলানিকেতন"

ভরতনাট্যম নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্র

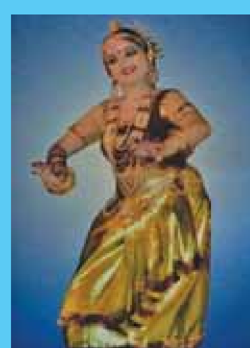

এছাড়াও এখানে রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুল নৃত্য ও অন্যান্য নৃত্য শেখানো হয়।

নৃত্য শিক্ষিকা— শুভশ্রী নন্দী

যোগাযোগের ঠিকানা

শুভশ্রী নন্দী

কংগ্রেস নগর (আচারের গলি), জলপাইগুড়ি,

মোবাইল - ৮১৭০০৭৬৯৫৩

হাঁটতে থাকুন

শীতকালের সকালে ঘুম ভাঙতে চায় না। কিন্তু নিয়মিত মর্নিংওয়াক বা প্রাতঃভ্রমণ করাটাও আমাদের পক্ষে জরুরি। একবার কষ্টকরে ঘুম থেকে উঠে মর্নিংওয়াক সারতে পারলে সারাদিনটা কত তরতাজাভাবে কাটানো যায় সেটা বোঝা যায় যিনি মর্নিংওয়াক করেন, তার থেকে। আমি নিজে মর্নিংওয়াক করে যে ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছি তা হলফ করে বলতে পারি। তাই আসুন না ঘুম থেকে একটু কষ্ট করে উঠে পরিবারের সকলে মিলে প্রাতঃভ্রমণ সেরে সারাদিনের জন্য তরতাজা হই।

মর্নি ওয়াক কেন করব?

সকালে ঘুম থেকে উঠতে গায়ে জ্বর আসে। তাহলে জেনে রাখুন রাতে ভাল ঘুম হওয়ার জন্য সকালে উঠে মর্নি ওয়াক করার মতো ওষুধ খুব কম আছে। এটা প্রমাণিত যারা মর্নিং ওয়াক করেন তাদের বাকিদের থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বেশি গভীর ঘুম হয়। আর রোজ একই সময়ে উঠতে থাকলে আপনার স্লিপ সাইকেল নিয়মিত ও স্বাস্থ্যকর হয়।

স্বাস্থ্যের দিক থেকেও মর্নিং ওয়াকে লাভের দিক অনেক। প্রথমতঃ শরীরে মেটাবলিজম উন্নত হয়। প্রতি দেড় কিমি হাঁটলে ১০০ কিলো ক্যালোরি পর্যন্ত শক্তি ব্যয় হয়, ফলে ওজন কমাতে এর জুড়ি মেলা ভার।

দ্বিতীয়তঃ মর্নিং ওয়াক করলে হাইপারটেনশন ও ডায়াবেটিসের প্রবণতা কমবে।

তৃতীয়তঃ এল.ডি.এল. বা খারাপ কোলেস্টরল কমায় আর এইচ.ডি.এল. বা ভাল কোলেস্টরলের পরিমাণ বাড়ায়।

চতুর্থতঃ ফুসফুস তার রক্তে আরও ভাল পরিমাণে অক্সিজেন পায়। ফলে ব্রেনও উপকৃত হয়।

পঞ্চমতঃ হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল ভাল হওয়ার কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

ষষ্ঠতঃ সারাদিন কাজ করার ইচ্ছা ও এনার্জি ভরপুর পাওয়া যায়।

এত গেল উপকারের দিক। এবার প্রশ্ন কতটা হাঁটবেন? সাধারণ ৩০ মিনিট থেকে ৪৫ মিনিট সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন অবধি হাঁটলেই হবে।

তবে অনেকটা নির্ভর করে নিজের শরীরের কতটা প্রয়োজন। প্রথম দিকে সময় ও গতিবেগ কম দিয়ে শুরু করবেন। আস্তে আস্তে দুটোই বাড়াবেন এবং হ্যাঁ অবশ্যই জুতো পরে হাঁটবেন। হাঁটবার সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নাক এবং মুখ দুটোই ব্যবহার করবেন। আসুন আজ থেকেই নিয়মিত মর্নিং ওয়াক শুরু করি। তাহলে দেখবেন ছোট ছোট রোগ থেকে মুক্তি পাবেন এবং বড় রোগ থেকে অনেকটা দূরে সরে থাকতে পারবেন।

ঋতুপর্ণা দত্ত

কেরালা টুর ২০১৭

জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭
(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)
১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)
৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)

টুর প্যাকেজে থাকছে

১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) (**ট্রেনের খাবার বাদে**)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

শালবনে রক্তের দাগ

ডুয়ার্স জুড়ে জঙ্গল কেটে কাঠ পাচার এখন নিত্য ঘটনা, কিন্তু কেউ সেই কাজের সাক্ষী হয়ে গেলে মুশকিল। পাচারকারীরা ধরে বেঁধে জঙ্গলে ফেলে রেখে আসবে, যেখানে রাতে পশুরা নুন চাটতে আসে। এদিকে বৃষ্টি নেমেছে আকাশ জুড়ে, নদীতে জল বেড়েছে। সবুজ হয়ে উঠছে ডুয়ার্সের বন-জঙ্গল। কাঠ পাচার, বন্য জন্তু পাচারের পাশাপাশি জমে উঠেছে কাজ দেবার নাম করে মানুষ পাচারের খেলা। এখান ডুয়ার্স পত্রিকায় **সাগরিকা রায়**-এর থ্রিলার— **'শালবনে রক্তের দাগ'** ধারাবাহিকের এবারের পর্ব।

(৫)

আপনাকে একবার বডি সনাক্তকরণের জন্য আসতে হবে থানায়। আমাদের মানে আমি লোকটিকে দেখেছি, কথা বলেছি, সুতরাং আমার ধারণা ভুল নয়। তা হলেও স্কেচ অনুযায়ী বডি একই লোকের কিনা জানতে হবে। আসুন থানায়।

সন্দীপ ফোনের কানেকশন অফ করে দিলেও আমি ফোন কানে চেপেই হাবা গঙ্গারাম হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এ কী জ্বালায় পড়লাম? দু'দিন পরে রুক্মিণী আসছে। আমি এখন থানা-পুলিশের চক্করে পড়ে থাকব? আলিপুরদুয়ারের সলসলা বাড়িতে ডুয়ার্স উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম গত বছর! ডুয়ার্স খুব টানছে। শ্রমিকদের মাদল শুনব চাঁদনি রাতে ঘাসের ওপর শুয়ে...! যত্তসব ঝামেলা কাঁধে চেপে বসেছে সিন্ধাবাদের পিশাচ বুড়োর মতো! কিছুতে ঝামেলা মুক্ত হতে পারছি না। আমার আলিপুরদুয়ারের বাড়িতে থাকা হয় না। ওখানেই ক'টাদিন কাটানোর প্ল্যান ছিল। দেখা যাক, কী হয়!

উপায় নেই। পুলিশে ছুঁয়েছে, আঠারো ঘা খেতে হবে। থানায় গেলাম। কী দেখব জানি, মন বেজার হয়ে আছে। গা ঘিনঘিন করছে। ফের সেই বডি দেখতে হবে? অথচ কে এই অনির্বাণ বসু? তার জন্য এত হাঙ্গামা পোহাতে হবে কেন আমাকে?

বোধহয় নির্দেশ দেওয়া ছিল। আমাকে সন্দীপের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। একজন কনস্টেবলকে ইশারা করল সন্দীপ। সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে বলে দাঁড়াল। আমি যেতে চাইছি না বুঝে সন্দীপ সহানুভূতির সুরে কথা বলল— এগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। বিশেষ করে আপনিই লোকটাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেখেছেন। আপনাকে এটা মেনে নিয়ে হেল্প করতে হবে আমাদের। প্লিজ। আরে, এসব আমাদের কাছে কিছুই না।

একটা করিডর পেরিয়ে এলাম। ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে যেন চারপাশ। হিম হিম গন্ধ। কোরা কাপড়ের গন্ধ ভাসছে। মৃত্যুর গন্ধটা বড় বিশ্রি। গায়ে সেঁটে থাকে। টাটকা রক্তের গন্ধের সঙ্গে বাসি রক্তের গন্ধের বিপুল পার্থক্য।

আধো অন্ধকার ঘরে অল্প আলো জ্বলছিল। গোটা চারেক বডি ঢাকা দেওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। পুলিশকর্মী আমাকে একেবারে সামনেই যে শুয়ে আছে, সেখানে

গিয়ে দাঁড়াল। ঢাকা তুলে নেওয়ার আগে একবার আমাকে দেখল। আমি সম্মতি জানাতেই ঢাকা তুলে দিল। দেখছি অনির্বাণ বসু একটা লাশ হয়ে শুয়ে আছে। মুখ সে ভাবে হাঁ করে রাখা। ঠান্ডা, শক্ত একটা শরীর আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে হেসে উঠল। হা হা হা!

চমকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। লোকটা মরেনি? মরার ভান করে ছিল? এ কী কান্ড? অজান্তেই প্রচণ্ড কাঁপুনি ধরেছে শরীরে। পুলিশকর্মী নিস্পৃহ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে জানতে চাইল —হয়ে গেছে স্যার?

আমি ফের অনির্বাণ বসুর দিকে তাকালাম। নিথর শরীর নিয়ে শুয়ে আছে লোকটা। চোখ বিস্ফারিত। মুখ হাঁ। বাপ্‌রে! আমি মর্গে ঢুকে ভয় পেয়েছি। আর সেই কারণেই উদ্ভট দৃশ্য দেখছি। উফ্ফ, পুলিশদের কত কিছু সহ্য করতে হয়!

ফিরে গিয়ে আমার বয়ান দিলাম। জানালাম এই লোকটাই এসেছিল আমার বাড়িতে। আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল। যদিও আমার সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্কই নেই বা ছিল না লোকটার। বাজ পড়ার মতো আমার জীবনে এসেছিল, চলেও গেল। পুরোটাই ম্যাজিক যেন।

কেউ জানতে পারেনি অ্যাক্সিডেন্টের সময় আমি ওখানে ছিলাম। কোনও দরকার নেই আগ বাড়িয়ে খবর দেওয়ার। কিন্তু...। ধাবায় জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন যদি কোনওভাবে আমার নাম উঠে আসে? ভিড়ের মধ্যে কেউ আমাকে দেখেনি, সে ব্যাপারে সিওর হব কীভাবে? বেশি চাতুর্য্য দেখাতে গিয়ে ঝামেলা বাড়বে।

—আজ ধাবায় খেতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে ব্যবস্থা রাখিনি। মুড ছিল না। বুঝতেই পারছেন অফিসার। তো ধাবায় খেতে বসব, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ধাবা থেকে খানিকটা দূরে। ভিড় দেখে দেখতে গেলাম। কিন্তু কেউ একজন বলল ট্রাকের নীচে পড়ে পিষে গেছে লোকটা। আর দেখার আগ্রহ ছিল না! সহ্য করতে পারব না। আমার আবার বি. পি. হাই!

—আচ্ছা, ওখানে গিয়ে দেখলে এই লোকটাকেই দেখতে পারতেন। এ ওখানেই চাপা পড়েছে। ট্রাকটাকে পাওয়া যায়নি। আর আজ একই দিনে তিনটে পথ দুর্ঘটনা হয়েছে। এটা ট্রাকে, আর একটা বাসের সঙ্গে রেষারেষি করে বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আর একটাও ট্রাকের সঙ্গে। বাসের ড্রাইভার, খালাসিকে ধরা হয়েছে। ট্রাক দুটোর একটাও ধরা পড়েনি।

যাক। আপাতত ঝামেলা চুকল। থানা থেকে বিদায় নিলাম। এখন দুটো দিনের অপেক্ষা। রুক্মিণী আসবে। ডুয়ার্সে চলে যাব। পনেরই জুন বর্ষা ঢুকে যাচ্ছে। এই সময় ডুয়ার্সের রূপ না দেখলে জীবন বৃথা। সঙ্গে রুক্মিণী থাকলে... !

দুটো দিন কেটে গেল শান্তভাবে। মেঘ করে আসছে। বৃষ্টি হল অল্প অল্প। নিখিল মাহালি ফোন করেছে যখন, ছাদে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখছি। নিখিলের সঙ্গে কথা বলে মন খুশ হল। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। ডুয়ার্স ডাকছে। নিখিল আছে ওখানে। একটা খবর দিয়েছে। রুক্মিণীকে জানিয়ে দিই আমাকে ডুয়ার্স চলে যেতে হচ্ছে। ওকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যাবে শ্যামল। শ্যামল আসছে কাল। মুড ফিরে এসেছে। ভাল লাগছে। কলেজে ছুটি আছে। চলে যাই।

রাতে বৃষ্টি নেমেছে। ভোরে বৃষ্টি হলে প্রবলেম হয়ে যাবে। তবে এখন ডুয়ার্সের সেই বন নেই। বৃষ্টির পাগলপানা আর নেই। রুক্মিণী সঙ্গে থাকলে অন্য ব্যাপার। তখন প্রকৃতি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তখন অবিরাম বর্ষণ।

ও বুঝে ফেলেছে কাঠ পাচার হচ্ছে। কিন্তু ওকে সাক্ষী রাখবে না পাচারকারীরা। নিখিল লুকোতে চেষ্টা করেছিল। তবু ওদের চোখ এড়াতে পারেনি। পালাতে পেরেছে, কিন্তু সনাক্ত হয়ে গেছে। এদিকে গতকাল মালবাজারের রানিচিরা চা-বাগান থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ উদ্ধার করেছে ওদলাবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা।

ভোরেই গাড়ি বের করে রেডি শ্যামল। রাতেই এসে গেছে ও। মুম্বইতে গিয়েছিল চারদিন আগে। গত রাতেই ফিরেছে। ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশ কালো হয়ে আছে। গাছেরা জল খাবে। সতেজ হবে। ক্রমশ ঠান্ডা আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ঢুকছি। এরই মধ্যে নিখিল ফোন করেছে। কী হল আবার?

নিখিল খবর নিচ্ছে আমি বেরিয়ে পড়েছি কিনা। ডুয়ার্সে নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। জল বেড়েছে চেল, ঘিস, লিস, মাল, জলঢাকা নদীতে। বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন।

—আচ্ছা, বেশ। আজ গিয়ে খিচুড়ি খাব। মনে রেখ।

নিখিল আমতা আমতা করছে। হল কী? ফোনে বেশি কথা বলা যাচ্ছে না। নিখিলের মুখভাব দেখতে পাচ্ছি না। তবু জানি নিখিল অযথা বোকা হওয়ার মতো ছেলে নয়! হল কী? ও কি কোনওভাবে ঝামেলায় পড়ে গেছে? বলছে না কেন?

নিখিল প্রায় কেঁদে ফেলল— ও কাঠ মাফিয়াদের নজরে পড়ে গেছে। ওরা ভয় দেখাচ্ছে।

—ভয় মানে?

নিখিল যা বলল তাতে বোঝা গেল অবাধে কাঠ পাচার হচ্ছে ডুয়ার্সে। যথেষ্ট পাহারা নেই। ফলে চলছে কাঠ মাফিয়াদের তাণ্ডব। নিখিল একটা ঘটনার সাক্ষী হয়ে গেছে।

আমি হতবাক। নিখিল বলছে কী এসব? একটা ভাল খবর আছে বলেছিল কাল। সেটা কি কাঠ মাফিয়াদের চিনতে পারাটা? ভুল করেছে নিখিল। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হলে ওদের সাথে খেলতে হয়। কিন্তু নিখিল কি জীবনটাকে ভালোবাসেনি? পাগলামি করে ফেলল বেচারি!

(৬)

আমার বাড়িটা কাঠের। বয়স হয়ে গেছে। বাইরেটা একই রকম আছে। ভেতরটা রিপেয়ার করেছি কাঠ দিয়েই। আমার বাগানের সবুজ-সমারোহ জলে ভিজে দুলছে অদৃশ্য দোলায়! রাসলীলা? নাকি ঝুলন? প্রেম পাগল রাই-কেষ্টার মতো। ঝুম ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। নিখিল চা বানিয়ে দিল। ঘটনাটা ওর মুখ থেকে শুনলাম। পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে গিয়ে ওর চোখে পড়েছে কয়েকটা লোক গাছ কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। লোক আছে সময়মত গাছটাকে তুলে নেওয়ার। এই দৃশ্য চোখে পড়েছে নিখিলের। ও বুঝে ফেলেছে কাঠ পাচার হচ্ছে। কিন্তু ওকে সাক্ষী রাখবে না পাচারকারীরা। নিখিল লুকোতে চেষ্টা করেছিল। তবু ওদের চোখ এড়াতে পারেনি। পালাতে পেরেছে, কিন্তু সনাক্ত হয়ে গেছে। এদিকে গতকাল মালবাজারের রানিচিরা চা-বাগান থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ উদ্ধার করেছে ওদলাবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। রেইড হবে খবর পেয়ে জঙ্গলের রাস্তায় সাইকেলে করে পাচার হচ্ছিল সেগুলো। কাঠ পাওয়া গেছে, যদিও পাচারকারীরা জঙ্গলের ঘাঁতঘোত দিয়ে পালিয়েছে।

—এখন কারা তোমাকে হুমকি দিচ্ছে?

—জানি না। কিন্তু বলছে আমিই নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে খবর সাপ্লাই করেছি। এর জন্য রেডি থাকতে। ওরা খুব নিষ্ঠুর স্যার। বেঁধে জঙ্গলে ফেলে আসবে। রাতে নুন চাটতে আসে পশুরা, তারই কাছাকাছি ফেলে রাখবে। কত লোককে মেরে ফেলল এভাবে!

তুমি কি ওদের চেন? বা চিনতে পেরেছ?

—চারজন ছিল। আমি স্যার দু'জনকে চিনতে পেরেছি। সেদিন নদীতে গাছ কেটে ভাসিয়ে দিচ্ছিল যখন, তখন দু'জনকে দেখে মনে হল ওদের আমি কোথায় দেখেছি! কিন্তু—

—মনে করতে পারছ না! একদিন ঝট করে মনে পড়ে যাবে দেখ। দেখা যাক।

বাইরে অবিরাম বর্ষা। রাস্তাঘাট ডুবে যাচ্ছে। আচ্ছা, অরণ্য সপ্তাহ কোন মাসে হয় যেন? আমাকে অন্যমনস্ক দেখে নিখিল চলে গেল ঘরের কাজে। শ্যামলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। শ্যামল আবার ভোরে রুক্মিনীকে আনতে যাবে। তার আগেই কথা হয়ে যাক। শ্যামলকে আমার রুমে ডেকে নিলাম। শ্যামল যখন মুম্বাইতে, তখন যে সব ঘটনা ঘটেছে ওকে কিছু জানানো হয়নি!

শ্যামলকে একটা কাজ দেব। সে ব্যাপারেই কথা বলব।

বাইরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে অবিরাম। ঘরে বন্ধ দরজার ভেতরে শ্যামল মন দিয়ে আমার কথা শুনতে থাকে। বরাবরের মতো মুখে সামান্য কুঞ্চন দেখা যায় না। নির্বিকার চোখ মেলে কথা শোনে। কথা শেষ হলে ওর দিকে তাকাই। কী বলবে শ্যামল এবারে শুনি সেটা। শ্যামল কোনও কথা বলল না। সামান্য ঝুঁকে সম্মতি জানাল। আমার কথা শেষ হল। বিদায় নিয়ে চলে গেল শ্যামল। শ্যামলকে যে কাজ দেওয়া হোক, ও আজ পর্যন্ত বিফল হয়নি। কিন্তু সন্দীপের থেকে নেওয়া সেই মেয়ের স্কেচের জেরক্স কপি শ্যামলকে দিতে ভুলে গেলাম। মাটি খুঁড়ে হলেও মেয়েটিকে খুঁজে বের করবে শ্যামল। যাই হোক না কেন, মেয়ে গেল কোথায় জানতে হবে! সে কে? কেনই বা মিথ্যে বলে ঢুকেছিল আমার বাড়িতে? অনির্বাণ বসু আসলে কে? কে পাঠিয়েছিল অনির্বাণকে আমার বাড়িতে? আমাকে মেরে ফেলতে? বাট, হোয়াই?

রাতে মনে হল গুলি চলছে কোথায়। হাজার হরিণ ছুটে পালাচ্ছে ঘন জঙ্গল ভেদ করে। টলতে টলতে পড়ে গেল কয়েকটা হরিণ। রক্ত! আর রক্ত! রক্ত-বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চাল ফুঁড়ে রক্ত পড়ছে। আমার শরীর ভিজে যাচ্ছে রক্তে। নোনতা গন্ধে ঘর ভরে গেছে। হরিণের মৃতদেহ পড়ে আছে ভেজা ভেজা মাটির ওপর।

ঘুম ভেঙে গেল তীব্র অস্বস্তিতে। বিশ্রি স্বপ্ন! ঘর অন্ধকার করে ঘুমনোর অভ্যেস। বেডসাইড টেবিলের আলো জ্বেলে উঠে বসলাম। খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কেমন অস্বস্তি হচ্ছে! যেন ঘরে আমি ছাড়াও আর কেউ আছে! ঘরে কেউ ঢুকেছিল কি? দরজা... দরজাটা খুলে রেখেই কি শুয়ে পড়েছিলাম? এরকম কখনও হয়নি! বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গেলাম। দরজায় হাত রেখে চমকে উঠলাম। দরজা খোলা! কেন দরজা খোলা থাকবে? স্পষ্ট মনে আছে, এবং এটা আমার চিরকালের অভ্যেস, আমি ঘুমনোর সময় দরজা বন্ধ করে শুই। কাল কেনই বা আমার মতিভ্রম হবে? নির্জন জায়গায় (বিশেষ করে যা ঘটে গেল দু'দিন আগে আমার সাথে) তুমুল বর্ষার মধ্যে দরজা খুলে রেখে ঘরটা বিভিন্ন পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে রাতেই দিনের সৃষ্টি করে ফেললাম। আমার হাতে লেজার অটোমেটিক। যদি সে এসেছিল, কিন্তু এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো সময় বা সুযোগ পায়নি, তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে তো হবে! শ্যামল আমাকে এই অস্ত্রটা এনে দিয়েছে।

—একা থাকবেন স্যার। বিপদের কথা কিছু বলা যায় না।

হুম, দেখছি শ্যামল মিথ্যে বলেনি! খাটের নিচে সোফার পেছনে। ওয়াশরুমে... কোথাও টিকটিকির লেজটুকুও দেখলাম না। অর্থাৎ যিনি এসেছিলেন তিনি চলে গেছেন। দুঃখ একটাই। জানা হল না তিনি কে! আর আমার পেছনেই বা কেন উঠে পড়ে লেগেছেন! সত্যি বলতে আমার সেই অর্থে কোনও শত্রু আছে বলে আমি জানি না। রাতারাতি কোথা থেকে শত্রু জন্মাল, কেই বা বলবে। কিন্তু মধ্য রাতে সে এসেছিল কেন জানতে হবে। অযথা তো আসেনি!

নিবিষ্টমনে ভাবতে বসলাম। প্রথম থেকে ভেবেও কিছু কুল কিনারা পাচ্ছি না। প্রথমে ভাবতে হবে আমাকে মেরে কার কী লাভ! বিয়ে-থা করিনি। খানিকটা নারীসঙ্গ করা ছাড়া আমার দোষ বলতে কিছু আছে কিনা জানি না। হয়ত রুক্মিণী এসেছে জীবনে বলে আইভি ক্ষেপে গেছে। গল্পের বইতে এমন হয়। বা বউয়ের প্রেমিককে সুপারি কিলার দিয়ে খুন। কিন্তু আমার চারজন প্রেমিকার তিনজনেরই নিজের স্বামী-পুত্র আছে। রুক্মিণী ডিভোর্সি। নিঃসন্তান। শরীরের চাহিদা মেটানো ছাড়া পরপুরুষের সঙ্গে যা চলে স্বামীর সঙ্গে সেটা হয় না। সেখানে ভদ্রলোকের মেয়ের পরিচয়টা কাঁটা হয়ে সামনে ত্রিশঙ্কুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে বিছানায় উন্মত্ততা দেখাতে অসুবিধা নেই। এর বাইরে ঈর্ষার কোনও জায়গা নেই। কেউ নিজের সামাজিক জায়গাটা খোয়াতে চায় না। লতা চেয়েছিল। ওর স্ফুরিত ঠোঁট মেলে জানতে চেয়েছে আমি ওর সঙ্গে থাকতে চাই কি না। সেটা অসম্ভব বলাতেও মানছিল না। সে কী পাগলামি! এক রাতে নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এল। বিবস্ত্র হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে —বল, কী নেই আমার?

সবই আছে! নিখুঁত হিসেবেই আছে। আমরা সেদিন দুজনেই তৃপ্ত হলাম। তারপর ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম শ্যামলকে দিয়ে। ওর হাজব্যান্ড জানতে পেরেছিল...। কিন্তু আমিও নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিলাম লতার প্রতি। সেই রাতে ওর সঙ্গে শেষ দেখা। আর ওর ট্রেস মেলেনি। মেলার কথাও নয় অবশ্য। লতার বোন কেস ঠুকে দিয়েছে। পুলিশের নজর সব সময় আগে স্বামীর দিকেই পড়ে এসব ক্ষেত্রে। এখানেও সেটাই হয়েছে। বরটা বোধহয় জেলে...। অনেকদিন কোনও খবর নেওয়া হয়নি। তো, লতা ছাড়া কেউ পাগলামি করেনি। আমি বেশ। কাল শ্যামল গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে রুকুকে নিয়ে আসবে। নাকি আমিই যাব? নিয়েই আসি। ডুয়ার্সের বৃষ্টি ভেজা পথ বেয়ে চলে যাই। আমার রুক্মিণী অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

রাত দুটো। একটু রেস্ট নিই। বিছানায় যাওয়ার আগে আলোগুলো নেভাতে থাকি। বেডসাইড টেবিলের আলোটা জ্বলছে। শুতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এটা কী? লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালি। আমার বিছানার ওপরে ওটা... একটা বিশাল পাইথন! নড়ে উঠেছে! কুতকুতে চোখে দেখছে আমাকে! দরজাটা কোনদিকে যেন...। কেমন করে সাপ ঢুকেছে ঘরে?

(৭)

—জীবনের তিন ডব্লিউ। ওয়াইন, উইমেন আর ওয়েপন। এরই সঙ্গে চাই টাকা। ওয়েলথ! ইত্যবসরেই চোখ স্থির। সন্ধে থেকে চলছে। রুক্মিণীর বাবা সত্যম দাশগুপ্ত। আমাকে দেখে খুশি হল কিনা বোঝা গেল না। তাকাল মাত্র। কিন্তু কথা চালিয়ে যাচ্ছে। ওঁর ওয়াইন আর উইমেনের খবর জানে না এমন কেউ নেই। ওয়েলথ সুপ্রচুর। কিন্তু ওয়েপন সম্পর্কে তেমন জানি না। একটু সন্দেহ আছে আমার। সত্যম দাশগুপ্ত ওয়েপন সম্পর্কে কতটুকু জানে? রেস্তোরাঁর ব্যবসায় এত টাকা? অস্ত্রপাচারকারী হিসেবে অভিযোগ ছিল এক সময়।

এয়ারপোর্ট বেশি ছিমছাম। আমি এসেছি

প্রথমে ভাবতে হবে আমাকে মেরে কার কী লাভ! বিয়ে থা করিনি। খানিকটা নারীসঙ্গ করা ছাড়া আমার দোষ বলতে কিছু আছে কিনা জানি না। হয়ত রুক্মিণী এসেছে জীবনে বলে আইভি ক্ষেপে গেছে। গল্পের বইতে এমন হয়। বা বউয়ের প্রেমিককে সুপারি কিলার দিয়ে খুন।

রুক্মিণীকে রিসিভ করতে। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে অপেক্ষা করছি। আজ রুক্মিণীকে নিয়ে শিলিগুড়িতে থেকে যাব ভেবেছিলাম। হোটেল রাপুনজেলে রুম বুক করা আছে। ওর বাবা এসে হাজির হবে সেটা রুক্মিণী জানায়নি আগে! এখন আমি গয়েরকাটায় আমার বাড়িতে চলে যাই।

রুক্মিণী আমাকে বুঝল। বাবাকে নিয়ে রাপুনজেলে চলে এল। রাতভর সত্যম দাশগুপ্ত মদে চুর হয়ে পড়ে থাকল। রুক্মিণী চলে এল আমার রুমে। ওয়াইন বাপের মতো মেয়েরও পছন্দের। কিন্তু মেয়ে ঘোরে পড়ে না। গুছিয়ে কথা বলতে পারে। কথায় কথায় বলল কাঠমান্ডু যাবে নেক্সট বারে। বাবাও যাবে সঙ্গে। বাবা নাকি মাঝে মাঝে যায়। ওখানে রুক্মিণীর বাবার প্রচুর বন্ধু আছে।

—তোমার বাবার ওয়েপন আর ওয়েলথ খুব পছন্দ।

—ওয়েপন! আমারও পছন্দের। আমার নিজস্ব কোল্ট রিভলবার আছে। এ কে ফরটি সেভেন আমার ফেভারিট।

বাহ্! এমন মেয়েই তো বান ডাকাতে পারে জীবনে!

—বাবা এবারে গরুমারা যাচ্ছে। গন্ডার দেখতে। রুক্মিণী সুন্দর করে হাসল —বাবা পশুপাখি খুব ভালবাসে। জানো তো, গরুমারায় প্রচুর পাখি আছে। আর...

—আর আছে কিং কোবরা! পাইথন! নানা প্রজাতির সরীসৃপ!

—ওয়াও। জড়িয়ে ধরল রুক্মিণী আমাকে। মধুর মুহূর্তে কেন যে বিছানায় পড়ে থাকা পাইথনটার কথা মনে হল! রুক্মিণীর নরম পেলব হাত আমাকে জড়িয়ে আছে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শ্যামল কি খোঁজ পেল কে ঢুকেছিল আমার ঘরে? ও ফোন করেনি। হয়ত জানানোর মতো কিছু পায়নি। আমার বিছানায় কেউ এসে সাপ রেখেছিল। যা হচ্ছে, তা থেকে এটা পরিষ্কার কেউ আমাকে মারতে চায়। সে কে? তারা কারা? আর কেন মারতে চায়?

—হাই ডিয়ার! ঝিমিয়ে আছ কেন? হিস হিস করে হেসে উঠল রুক্মিণী —জাগো... উমম...!

একটা সময় তৃপ্ত শরীর সরিয়ে নিল রুক্মিণী। এবারে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে। আমার ঘুম নেই। ওয়াশরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম। জলে ভেজা মুখটা চেনা নয়। অন্য মানুষ যেন। এই লোকটাকে কি আমি চিনি?

কল খুলে দিয়ে শ্যামলকে ফোন করলাম। জলের শব্দে কথোপকথন ঢাকা দিতে হবে। শ্যামল আজ একবারও ফোন করল না! এটা স্বাভাবিক কি? আমি কেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

শ্যামল ফোন রিসিভ করেছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ভেবেছিলাম যদি শ্যামল ফোন রিসিভ না করে! এখন শ্যামলের গলা পেয়ে অস্বস্তি রাগে পরিণত হয়ে গেল। ফোন করে খবর দেবে তো!

—তুমি কোথায় ছিলে? আমি... , তোমার একটা ফোনের জন্য আমি অপেক্ষা করছি, তুমি জান না?

—জানি স্যার। কিন্তু কোনও ক্লু পাইনি। তবে একটা নিউজ আছে। যে মেয়েটার স্কেচ দিয়েছিলেন, সেই মেয়েটাকে দেখেছি। ওকে ফলো করে সারাদিন গেল! কাল ফিরছেন তো?

—ফিরছি। নিখিল ঠিক আছে?

—এখনও ঠিক আছে। খুব ভয়ে আছে।

—এখন রাখছি। ফোন রেখে ওয়াশরুমের দরজা ফাঁক করে রুক্মিণীকে দেখে নিলাম। ঘুমোচ্ছে। আড়ি পাতেনি। ওর বাবা সত্যম দাশগুপ্ত কী করছে তার রুমে? একটু খোঁজ নিই?

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হলাম। সত্যম আমাদের পাশের রুমেই আছে। করিডর ঠান্ডা হয়ে পড়ে আছে। প্রাণের উপস্থিতি নেই কোথাও। স্বাভাবিকভাবেই পায়চারি করে চারপাশ দেখে নিলাম। সত্যমের দরজায় কান পেতেছি। কোনও সাউন্ড নেই। ঘুমিয়েছে বুড়োটা। ফিরেই আসছিলাম। হাসির শব্দে অবাক হলাম। কোনও রুমে কেউ হেসে উঠেছে! কোন রুমে? আস্তে দরজা খুলে গেল সত্যমের অপোজিটের রুমের। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল রুক্মিণীর বাবা সত্যম।

—কাউকে খুঁজছেন স্যার?

—বোধহয় আপনাকে।

—তাহলে আসুন ভেতরে। বিজনেসের কথা হোক।

—হোক হোক। আমি সত্যম দাশগুপ্তর উল্টোদিকের রুমে ঢুকে গেলাম। আমার মনে ছিল না সত্যম যে রুম বুক করেছে, সেই রুমে থাকবে না। এটাই দস্তুর। কথায় বলে সাবধানের মার নেই। যে বিজনেসের যা!

—ডুয়ার্সের চারটে ফুলকে এনেছি। কাল ওরা চলে যাচ্ছে দিল্লি। সত্যম ভদকা এগিয়ে দিল।

—টাটকা ফুল?

—হানড্রেড পার্সেন্ট। পার পিস পচাশ থাউ।

—টাটকা ফুলের দাম বেশি হওয়া উচিত।

—ফুল টাটকা কিনা পরীক্ষা করে নেবে? নাকি আজ আর...। পারবে না? হা, হ্, হা। বল, গন্ডারের শিং চাই? গলাটা আমার খুব কাছে এনে ফিসফিস করে সত্যম —লাগলে বল! আরে, আমার মেয়ের কথাটাও তো আমাকে ভাবতে হবে! হা হা হা! সত্যম ভদকা ঢালে গলায়।

এই লোকটা কি সত্যি সত্যি রুক্মিণীর বাপ? শালা খচ্চর কি আউলাদ! মেয়ের কামপূরণের জন্য দরদ উথলে উঠছে! কিন্তু, ওই চারটে ফুল...!

সত্যমের কথাটা মনে ধরলেও আজ উপায় নেই। আমার এই দুর্বলতা জানে সত্যম। আমি আসব জানলে সত্যম ব্যবস্থা করে রাখে। সত্যমের নারী পাচার চক্রের কথাটা জেনেও আমাকে চুপ করে থাকতে হয়। লোভ! লোভই আমার দুর্বলতা।

—ওসব পরে হবে। তুমি বাংলাদেশে যাচ্ছ আজকাল! কেন? সত্যমের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি। চোখে কোন ভাব ফুটে ওঠে দেখি।

—বেড়াতে। যাবে? মাছ খাওয়াব দশ রকমের। চ্যাংড়াবান্ধা বর্ডার দিয়ে চলে যাব। যাবে?

মাছ খেতে বাংলাদেশে যাচ্ছে সত্যম?

—রুক্মিণী বলল তুমি গন্ডার দেখতে গরুমারায় যাচ্ছ?

—ওহো হো। গন্ডার বড্ড ভালবাসি। তুমি গন্ডারের গুণের কথা জান না? বুডঢা জওয়ান হয়ে যায় প্রফেসর সাহেব। চাই তোমার? লাইন হোটেলে এত মাল কাদের জন্য? ছুকরিরা আসে। বুডঢারা কী আর করবে বল?

সত্যমের পুরোটা জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু জানি সেটা হবে বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া। মেরে নদীর চরে পুঁতে দেবে।

(৮)

ভোরেই ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে জলঢাকা যাব।

বৃষ্টি খুব জ্বালাচ্ছে। যদিও আমার ফেভারিট। পাশে বসে ঘুম চোখে রাস্তা

সত্যমের দরজায় কান পেতেছি। কোনও সাউন্ড নেই। ঘুমিয়েছে বুড়োটা। ফিরেই আসছিলাম। হাসির শব্দে অবাক হলাম। কোনও রুমে কেউ হেসে উঠেছে! কোন রুমে? আস্তে দরজা খুলে গেল সত্যমের অপোজিটের রুমের। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল রুক্মিণীর বাবা সত্যম।

দেখার চেষ্টা করছে রুকু। মেটালিক স্মোকি আইজ, ট্রেন্ড মেনে ডার্ক রেড লিপস্টিকে এই সকালেও সেক্সি দেখাচ্ছে ওকে। এই ভোরে পার্টি লুক? কেন জানতে ইচ্ছে করলেও চুপ ছিলাম। মেয়েদের কাছে তাদের মেকআপ নিয়ে কোনও কমেন্ট করা অনুচিত। প্রশংসা ছাড়া কিচ্ছু বলা যাবে না! সেটা টাইমলি করে যেতে পারলে সে তোমার পোষা বেড়াল। কেবল আদুরে ফররর ফররর!

জলঢাকায় ঢুকে গেলাম যখন, বৃষ্টি পাথর বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। ডুয়ার্স এখন অনেকটা শান্ত। একটা দুটো চা-বাগান খুলছে। বাকিগুলো খুলবে কি না কেউ জানে না। রেডব্যাঙ্ক, ধরণীপুর, রায়পুর চা-বাগান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। বন্ধ চা-বাগান পরিদর্শনে যাচ্ছেন সিটুর রাজ্য সভাপতি। আমার ইচ্ছে ছিল রেডব্যাঙ্ক যাওয়ার। খবর দিয়েছে শ্যামল। আজ আর গেলাম না। সেই কারণেই জলঢাকায় আসা। ভাবছিলাম ওপরের শান্ত পুকুর দেখে বোঝা যায় না ভেতরে কী আছে! শ্যামল খোঁজখবর রাখে। নির্বাচন হবে। কালচিনিতে জেলা পরিষদ আসনের জন্য তিনটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে মোর্চা। বত্রিশটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনের মধ্যে পনেরোটিতে প্রার্থী দিয়েছে। আবার শুনতে পাচ্ছি গুডহোপ, ওয়াশাবাড়ি, কলাগাছি, নাগেশ্বরী, বামনডাঙা চা-বাগানের শ্রমিকরা আজ নাকি কাজে যায়নি। শ্রমিক ধর্মঘট চলছে। এই টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নেবে সত্যমের মতো ব্যবসায়ীরা। মেয়েগুলো চলে যাচ্ছে কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে। ছেলেগুলোও। সত্যম নিজেই মনলু মাহাতোকে পাচারের কাজে লাগিয়েছিল রবিকে। আলিপুরদুয়ারের মনলু মাহাতোর বাবা রবি নামে এক যুবককে সন্দেহ করে সত্যমের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল। ওর ছেলে মনলুকে কাজের লোভ দেখিয়ে দিল্লিতে পাচার করেছিল রবি। আলিপুরদুয়ারের ডিপোপাড়ার বাসিন্দা মনলু। সত্যম রবিকে রাতারাতি ঝাড়খন্ডে পাঠিয়ে দেয়। কেউ বুঝতে পারার আগেই রবিকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পরদিন থেকে রবি হাওয়া। সত্যম হম্বিতম্বি করে লোকজন দেখিয়ে। শাস্তি দেবে বলে ওর সামনে হাজির করতে বলেছে রবিকে। কেউ খুঁজে পেল না বলে কাঁচুমাচু মুখ— রবি ঘরে নেই। ভেগেছে। এ নিয়ে রাগ দেখাল সত্যম— ইয়ার্কি নাকি? পাহারা ছিল না? ভেগেছে মানেটা কী?

সব মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যম ভয় পেয়েছিল। মনলু পালিয়ে এসে খবর দিয়েছে ওখানে ডুয়ার্সের অনেক ছেলে আছে। নানা রকম খারাপ অসামাজিক কাজ করায় সেখানে ছেলেদের। সত্যম ভয় পেলেও ওর হাত বহোত লম্বা। ঝামেলা মিটে গেছে তখনকার মতো। এখন ফ্রি আছে। বাট সামলে চলতে জানে বলে অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার পতনের মূল এটা জানে নিশ্চয় সত্যম দাশগুপ্ত!

আজও মুষলধারায় বৃষ্টি! ডুয়ার্সের চরিত্রই এই। বৃষ্টি একবার গা ছেড়ে নামলে আর ওঠার নাম করে না। কত মেঘ জমে থাকে আকাশে অলকা! এই কবিতাটা অনেকদিন হল লিখেছিলাম। পরের লাইনগুলো ভুলেছি। এখন মাঝেসাঝে কবিতা পড়ি যখন উত্তেজনা জমজম করে শরীরের কোষে কোষে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তখন কবিতা টানে আমাকে। সুন্দরী প্রেমিকার মতো টানে। ওয়াইপার চলছে। কাচের ওপর জল লেপটে যাচ্ছে। ফের ভরে আসছে। রাস্তার এক ধারে ডিভাইডার। অন্য পাশে সবুজ বনানী। সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। ভিজে রাস্তা স্কিড করতে পারে।

পাশেই রুক্মিণী বসে আছে জিনসের ওপর শর্ট শার্ট পরে। গাড়ি থামাতে বলল। স্মোক করতে চায়। ব্রেকফাস্টের পরে একবার করেছে। এখন জল দেখতে দেখতে মুড এসেছে। রাস্তার ধারে গাড়ি রাখতেই রুক্মিণী আমার পাশে লেপটে বসল। স্মোক নয়, হুইস্কি বের করেছে। বাইরে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী, গাড়ির ভেতরে ভাসছি আমরা। সত্যম এখন আমাদের দেখলে গন্ডারের শিঙের কথা জন্মে উচ্চারণ করত না।

জলদাপাড়া টুরিস্ট লজে পৌঁছে গেলাম। শ্যামল ওখানেই ছিল। আমাদের রুমে ব্যাগ পৌঁছে দিল ও। রুক্মিণী ওয়াশরুমে যেতেই শ্যামল আমার দিকে তাকাল। কিছু বলবে! পেছনের বারান্দায় চলে এলাম।

—কাজ কত দূর?

—কাল হবে অনুষ্ঠান।

—কোথায় ঠিক হল?

—নিমতিঝোরা চা-বাগানের কাছে।

—মেয়েটাকে কোথায় দেখেছ?

—জঙ্গলের ভেতরে যেতে দেখেছি। ফলো করেছিলাম। কিন্তু ফরেস্টগার্ডরা বলল বনের ভেতরে ঢোকার পারমিশন নেই।

—তাহলে মেয়েটা ঢুকছে কেমন করে?

—ভেতরে কোনও গুপি আছে স্যার। মেয়েটা ওদের পটিয়েছে। যা ফিগার!

আশ্চর্য! মেয়েটা এখানে করছে কী? আমার বাড়িতেই বা গিয়ে মিথ্যে বলেছিল কেন? বলেছিল ওর বাড়ি মাদারিহাটে। ও মাদারিহাট থেকে এখানে এসে ফরেস্টের ভেতরে ঢুকে কী করছে?

— নজর রেখে যাও। কালকের অনুষ্ঠানটা হয়ে গেলে জানাবে। আর যদি কোনও প্রবলেম থাকে, তাহলে প্ল্যান বাতিল করতে হবে। কাল নয়, পরশু হবে। বাট প্রোগ্রামটা হচ্ছেই। খুব সাবধানে এগতে হবে।

—সুভদ্র!

রুক্মিণী ডাকাডাকি করছে! শ্যামল মুহূর্তে হাওয়ায় মিশে গেল। আমি ঘরের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করলাম। রুকু ডাকছে!

লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে গেলাম। একাই। কাছেই এক গ্রামে একটা চিতা ঢুকে পড়েছে। একজনের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। লোকজন খুঁচিয়ে সেটাকে মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। খবরটা একটু আগে পেয়েছি। শুনে আর দেরি করলাম না! কী করে গ্রামের ভেতরে বাঘ ঢোকে? পাহারা ছিল না? এভাবে চললে হবে না। চারপাশে ক্যালানে লোকজন! ক্ষিপ্ত লাগছে! আমার লোক এই মুহূর্তের ছবি পাঠিয়েছে হোয়াটস্‌অ্যাপে। ঘরের ভেতরে বাঘটা রাগে পায়চারি করছে। ফরেস্ট গার্ডরা চলে এসেছে। ঘুম পাড়ানি বুলেট ছোঁড়ার প্রস্তুতি চলছে! ছবি দেখে বিরক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নিখিল বলেছে বন্য পশু পাচার হচ্ছে তীব্রভাবে। এই বাঘটা পাচার হচ্ছিল। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে কোনওভাবে! নেমে সামনে লুকনোর মতো যা পেয়েছে, সেখানে ঢুকে পড়েছে! এখন এটাকে ফের ঘুম পাড়িয়ে বনে ফেরৎ পাঠাও! তারপর! ফের পাকড়িয়ে ফের পাচার। কত হাজার বছর ধরে চলবে এই বৃত্তের খেলা! কেউ যেন মাথার ভেতরে ঢুকে পড়ে নাগাড়ে মন্তর পড়ছে— চলছে চলবে চলছে... উপায় নেই, দেবে আর নেবে— এটাই জীবনের মূলমন্ত্র! এর মাঝে পড়ে কিছু অসহায় প্রাণ! সেই প্রাণ কখনও বৃক্ষরাজি, কখনও প্রাণীকুল। সেই তালিকায় মানুষ নামক দোপেয়ে জীবও আছে। গাছ, পশুর মতো মানুষও পাচার হয়ে যাচ্ছে কত যুগ ধরে! অথচ কিছুই করার নেই! মাঝে মাঝে ছেলেবেলার কথা মনে হয়! চামুর্চি বাজারে তিনুদার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে কী হাড় কাঁপানো ঠান্ডা! উত্তরের হিম হিম বাতাসে অজগরের শ্বাস মিশে থাকে। মনে পড়ে এক হাটবারে গিয়েছি জয়ন্তীতে। সেখানে এক আদিবাসী মেয়ে সাপের বাচ্চা বিক্রি করছিল। মাটির ছোট হাঁড়িতে সাপের বাচ্চাগুলো কিলবিল করছিল। একটা হলুদ রঙের সাপের বাচ্চা খুব আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু পনের টাকা দামটা বড্ড বেশি ছিল সে সময়। আর তাই টাকা দিয়ে অজগরের বাচ্চা কিনে ফেলেছিলাম। সাপটা একটা মাটির হাঁড়িতে সুখেই ছিল। একদিন এক বিহারি সাপুড়ে এসেছিল দুপুরের দিকে। কোথা থেকে সাপের কথা জানতে পেরেছিল জানি না। লোকটা সাপটা দেখতে চেয়েছিল।

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

বাথরুমে সাত খুন...

কবি বলেছেন, টয়লেটে নয় লেট। তা রাজা বা মিঠুনের লেট না করে উপায় কী! মুশকিল আসান গাড়ির ডিকি আর রহস্যময় আস্তা বিরিয়ানির কথাও মনে রাখা দরকার। কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে কথা! আবার দেখ, টয়লেটেই আলাপ হলো গায়কের সঙ্গে! মুম্বই থেকে দিনে যতগুলো ফ্লাইট চেন্নাই যায় তার সব ক-টার একখানা করে টিকিট কেটে রেখেছেন তিনি। কথা দিয়েছেন জাহাজ পেলেই উড়বেন। উড়লেন কি শেষাবধি? বিস্তর কপি-পেস্ট করে গান বানাবার ধাক্কায় লেখক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না! বস্তুতঃ টয়লেট থেকে সিঙ্গিং-এর দিকে দৌড়োন এই পর্বের মূল কথা হলো বাথরুমগীতি। তবে দ্বন্দ্ব সমাস। গান ও বাথরুম যাকে বলে।

কেউ কেউ শখের কারণে বাথরুমে অতিরিক্ত সময় কাটান, তো কেউ কেউ কোষ্ঠ জনিত কষ্টের বাধ্যবাধকতায়। কেউ যদি সেখানে বসে প্রসাধনী ঘাঁটেন, তো কেউ পড়েন খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন। আর ইদানীং আবার দেখছি, অনেকেই মোবাইলটাও সঙ্গে রাখেন, প্রায় প্রতি বাথেই!

যাই হোক, অতি ব্যক্তিগত সময় যেহেতু, সেখানে তাই তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানো বা অনুপ্রবেশ ঠিক শোভনীয় নয়। মার্জনা করবেন, আমিও এই ব্যাপারে একদমই ঢুকে পড়তে চাইনি। কিন্তু, হঠাৎ চোখে পড়ল মি. পারফেকশনিস্ট, আমির খানের একটি ওয়েব ইন্টারভিউ। যেখানে তিনি বলেছেন যে পরিচালক রাজকুমার হিরাণির সঙ্গে থ্রি ইডিয়েটস ছবিটির প্রথম পর্যায়ের একটি জরুরি মিটিং তিনি বাথরুমেই সেরেছিলেন। কারণ তখন তিন সপ্তাহের জন্য তিনি মুম্বাইয়ের অনতিদূরে, ধোবিঘাট ছবির লোকেশনে ডেরা বেঁধেছিলেন। আর সেখানে প্রাইভেট মিটিং করার মতো ঘর বলতে সম্বল, ওই বাথরুমখানাই।

এটা পড়তে পড়তেই মনে পরে গেল, এক অতি বিখ্যাত বলিউড গায়কের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় অমনই এক নগন্য স্থানে হয়েছিল। এবং তৎ-পরবর্তী অভিজ্ঞতাটি অতি মজার। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগেই ঠেলেঠুলে আবার অন্য আরেক ভাবনা মাথায় চলে এল। এবং তা এতই বাধ্যতামূলক চাপ দিচ্ছে যে আগে সেটাকেই খোলসা করছি বাধ্য হয়ে!

মনে পড়ে কি, একসময় সিনেমাতে বলিউড হিরোইনদের বাথটবের দৃশ্য এক অতি জনপ্রিয় রেওয়াজ ছিল? কিন্তু ভেবে দেখুন, বাথরুম তো শুধু স্নান আর গানে সীমাবদ্ধ নয়। ইংরেজি ভাষার টয়লেট বা লু শব্দটির দিকে তাকানো যাক। এক বিশেষ জরুরি ক্রাইসিসে, তার স্টক ভ্যালু ক্রমে উর্দ্ধগামী হয় এবং এই ট্রেন্ডখানা এক কথায়, বিশ্বজনীন! যদিও বলিউডের সিলভার স্ক্রিনে

নায়িকাদের আমরা অমন বিব্রতিকর পরিস্থিতির খপ্পরে কোনওদিনই পড়তে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, সাহস আছে বটে হলিউডের!

—ও বাবা রে! মনে হচ্ছে আমি কয়েকটি আস্ত ক্রুজ মিসাইল গিলে ফেলেছি...

গ্লামারাস হিরোইন স্যান্ড্রা বুলক-এর মুখে এমন একটি সংলাপ শোনা গিয়েছিল এক সিনেমায়। দৃশ্যটি যদিও একটি কমেডি দৃশ্য। কিন্তু তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে নায়িকার পেটে চলছে সাংঘাতিক মাত্রার নিম্নচাপের রেড অ্যালার্ট। সেটার ওপর জোরসে চেপে বসে তিনি ছটফট করছেন গাড়ির সিটে। যে গাড়ি কী না আবার, এক প্রকাণ্ড সেতুর উপর যানজটে আটকে রয়েছে ন যযৌ ন তস্থৌ দশায়। অতঃপর এই সঙ্কট থেকে তিনি যে ভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন, বিলিতি সিনেমার সেই ঘটনাটি আমাদের নিখাদ দিশি গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সমতুল্য। মানে, ওই যে সেই যে বিখ্যাত গল্পটি আছে না? যেখানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে নৌকো ভ্রমণে বেরিয়ে, গোপাল চূড়ান্ত শিক্ষা দিচ্ছে রাজাকে। একদিকে রাজার পেটে অবিরাম কলকল আর অন্যদিকে শুধুই নানা ছলে নৌকো ঘাটে ভেড়াতে গোপালের বিলম্ব সৃষ্টি! চক্ষে লক্ষ লক্ষ সর্ষের ফুল দেখার পরে যখন শেষমেশ মহারাজা বিশেষ কর্মটি সমাধা করতে পেরেছিলেন তখন তিনি গোপালের থিওরিতে একশো ভাগ সম্মত। তাই নিজের মুখেই গল্পের শেষে স্বীকার করছেন, দরকারের সময় এই বিশেষ কম্মটি সুসম্পন্ন করতে পারার যে সুখ, সেটাই হল জগতের সবচেয়ে অতুল সুখ!

যাদের জীবনে সত্যি সত্যি সঘন বড় বাইরে-র বেগ ঘটিত এমন ক্রাইসিসের মুহূর্ত এসেছে, শুধু তারাই জানবেন এই ডেসপারেশন কতটা পরেশান ও বেলাগাম করে দিতে পারে মানুষকে।

ধরা যাক, আমারই এক পরিচিত বন্ধু মিঠুনের কথা। চাকরির ইন্টারভিউতে বেরিয়ে, মাঝ রাস্তায় সে টের পেল বিনা নোটিসে প্রকৃতির ডাক এসেছে। আর সে ডাক একেবারে অন্তিম মুহূর্তের ডাক। যেন পরীক্ষার হলে ঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটা লেফট রাইট মার্চ করতে করতে এগচ্ছে, আর লাস্ট বেল এই বুঝি বেজে ওঠে! ঘামতে ঘামতে, বাস থামিয়ে সে তখন নেমে পড়ল এক নির্জন রাস্তায়। মাথার ভেতর দামামা বাজাচ্ছে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগান। সেই বাহ্যজ্ঞানহীন দশায় একদম মরীয়া হয়ে, আর কিছু না পেয়ে, শেষমেশ সে রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা গাড়িগুলোর ডিকি ধরেই টানাটানি জুড়ে দিল। আর, ওই যে কথায় বলে না, ভাগ্য সবসময় সাহসীদেরই সহায় হয়... সেই কথাটাই সেদিন ওর বেলায় একেবারে মোক্ষম ভাবে খেটে গেল। কারণ টানাটানিতে সত্যিই একটি গাড়ির ডিকির ঢাকনা খুলে যায়। এবং কালবিলম্ব না করে তক্ষুনি সুযোগটির সদ্ব্যবহার করে, মিঠুন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে!

পরে যখন সেই গাড়ির মালিক মিঠুনের সেই কুকীর্তিটি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি নির্ঘাত সারাজীবনের জন্য সংকল্প নিয়ে ফেলেছিলেন, যে ডিকিটি লক না করে কদাপি আর পাবলিক প্লেসে গাড়ি পার্কিং করা নেই!

আরেক বারের কথা। হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরছি ভোরবেলার ফলকনামা এক্সপ্রেস ধরে। রামোজি ফিল্ম সিটিতে দু' সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত নিরামিষ ভোজন করে করে সকলের তখন বড়ই কাহিল দশা। এমতাবস্থায় দুপুরবেলায় বিজয়ওয়ারা স্টেশনে কামরার জানালায় 'আন্ডা বিরিয়ানি, আন্ডা বিরিয়ানি' হাঁক শুনে ক্যামেরাম্যান রাজা, তার বিপুল বপু নিয়ে ঠিক চিলের মতো গ্লাইড করে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে গেল জনাকীর্ণ সরু প্যাসেজ পেরিয়ে। তার কম্পিত ঠোঁটে আকুল প্রার্থনা, 'ও ভাই, ডবল আন্ডা মিলেগা? ডবল আন্ডা?'

চাওয়া তার অপূর্ণ রইল না। খানিক বাদে, মুখমণ্ডলে হাজার ওয়াট বাল্বের উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলে, সোনামুখ করে সেই জোড়া ডিমওয়ালা বিরিয়ানি দিয়ে লাঞ্চ খেল সে। আর সন্ধে গড়াতেই টের পেল, যে পেটের ভেতর কেলোর কীর্তি চলছে। ভীম বিক্রমে, ডিম বিদ্রোহ!

ট্রেনের টয়লেটখানি খালি পাওয়া আর বিদ্রোহী পেট খেপে খেপে সেখানে খালি করা, এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করতে করতে অতঃপর বেচারার হাড়মাস কালি হওয়ার দশা। ট্রেন ছুটছে মাঠঘাট বনবাদাড় পেরিয়ে। আর সেই সুবাদে কামরা একটু বেশি ঝাঁকুনি দিলেই রাজার মুখ টেনশনে পাংশু। মুখ বিকৃত করে এবং পেট চেপে ধরে নিজের মনেই সে তখন বিড়বিড় করে বলছে, হায় রে! দশ কিলোমিটার পর পরই ছড়াতে হয় যে বিরিয়ানি খেয়ে, রেল কোম্পানি কী হিসেবে প্ল্যাটফর্মে সে জিনিসের বিক্রি অ্যালাও করে! এটা পুরো মানুষ মারার ফন্দি নয়, ব্যাটাদের?

এরই মধ্যে গাড়ি একটা স্টেশনে ঢুকেছে। নিজের মোবাইলটা তৎক্ষণাত চেক করে দেখে রাজার বিমর্ষ মুখে এতক্ষণে একটা হাসির আভাস। সে বলল, অ্যাই পেয়েছি! নেটওয়ার্ক পেয়েছি!

—আমলেট! গারমা গারাম আমলেট!

প্ল্যাটফর্ম ফুঁড়ে ভোজবাজির মতো এক ফিরিওয়ালার উদয় হল তক্ষুণি, রাজার সাইড বার্থের জানালায়। কিন্তু ডিম শুনলেই তখন রাজার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। কানে ফোন নিয়ে ফিরিওয়ালার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক সে মাছি তাড়াবার ভঙ্গীতে হাত নাড়ল। সঙ্গে দাঁতে দাঁত পেষা একটি হাল্কা গর্জন জুড়ে দিতেও ভুলল না, ভাগো হিয়াসে! যত্ত সব মার্ডারারস!

ফোনটা ততক্ষণে তার কলকাতার বাড়িতে কানেক্ট হয়ে গিয়েছে। অতি সিরিয়াস ভাবে ফোনে মনোসংযোগ করল সে। বলল, হ্যালো মা? শোনো, খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা! আমার জন্য তুমি কাল সকালে কিন্তু অবশ্যই কাঁচকলা সেদ্ধ দিয়ে গোবিন্দভোগ চালের ভাত রেডি রাখবে, বুঝলে। শরীরটা বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছে...

এটুকু বলতে বলতেই ঘাম জমে উঠল তার কপালে। মায়ের তরফ থেকে তখন যথারীতি এক প্রস্থ ডিটেল ইনভেস্টিগেশন সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু ঝপ করে তাতে জল ঢেলে দিয়ে রাজা কাতর স্বরে বলল, —সব পরে... পরে বলছি। এখন আমি রাখি। আরে, ছাড়ছি, ছাড়ছি...!

ওপরের বার্থে শায়িত রাজু ফিচেল হাসি ঠোঁটে সাজিয়ে, পুরো ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করছিল। রাজা ফোন কাটতেই সে ফুট কাটল, ওরে, স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে কিন্তু টয়লেট ইউজ করা একদম বারণ! যে জ্ঞানের জবাবে, রাজা মুণ্ডুপাত সূচক কয়েকটি চোখা বিশেষেণ ছুঁড়ে দিল রাজুর দিকে। এবং নিজে, টয়লেটের দিকে ধাবিত হল ঝড়ের গতিতে। যেন অর্জুনের গাণ্ডীব লক্ষ্যভেদী তীর! তীরে এসে তরি না ডোবানোর মোক্ষম অনুরোধটি অবশ্য রাজার মুখে আমরা পরদিন সকালে শুনেছিলাম। সারা রাত অনবরত ধকলের পর অবশেষে ভোরের দিকে সে বেচারি দু'চোখের পাতা এক করতে পেরেছ। এদিকে সূর্যোদয় দেখবে বলে রাজু তখন বার্থ থেকে নেমে জানালার মেটাল শাটারটা খুলতে যাচ্ছিল। সেটা টের পাওয়া মাত্র, রাজা খপ করে তার হাত চেপে ধরে কাতর স্বরে বলল... প্লিজ ভাই, একদম খুলিস না! সকাল থেকে রেললাইনের ধারে খালি দেখব লোটা নিয়ে লোকগুলো বসে জমিয়ে ইয়ে করছে...! বিশ্বাস কর, ওদের ওই সুখ আমি একদম সইতে পারব না!

মুম্বাইয়ের সানা রেকর্ডিং স্টুডিওতে অবশ্য আমার ক্ষেত্রে এক অন্য চমক অপেক্ষায় ছিল টয়লেটে। ছাদের ওপর খোলা আকাশের নিচে সেখানে অতি উচ্চ এক সারি ইউরিন্যাল। প্রথম সাক্ষাতে স্টুডিও মালিক কুমার শানু হা হা করে হাসতে হাসতে সে সম্পর্কে বলেছিলেন, কলকাতা থেকে সবে এসেছিস... আগে পেট ঠেসে বেশি বেশি করে মুম্বাইয়ের জল খা। আর যা, যত খুশি হিসি কর... ছাদে যে জন্য জম্পেশ করে

টয়লেট বানিয়ে রেখেছি।

ঠিক দুক্কুর বেলায় সেই ইউরিনালে দাঁড়িয়ে শানুদার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলাম। সঙ্গে গুণগুণ করে নীচু স্বরে চলছে একটি সুপারহিট বলিউড নাম্বারের সুর ভাঁজা। এমতাবস্থায়, বলা নেই কওয়া নেই, ঠিক পাশের টয়লেট স্টলেই এসে দাঁড়ালেন, স্বয়ং সেই সুপারহিট গানের গায়ক মহাশয়, উদিত নারায়ণজী। চোখাচোখি হতেই, উনি মিষ্টি হেসে বললেন, হেলো! আমার মগজ আমায় বলল, বেসুরো গানটা শিগগিরি গে-লো!

ওই প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই মনে হয়েছিল উদিতজীর সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তার বাহারি গোঁফের নিচের মুচকি হাসিটি। এতদিন ফটোতে দেখে ভাবতাম, ওটা মনে হয় ছবি তোলার মুহূর্তের অভিব্যক্তি। কিন্তু রক্তমাংসের ব্যক্তিটিকে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে চূড়ান্ত ঝড় ঝাপটের মধ্যেও ওই হাসি নিভতে নারাজ। ওনার ওই মেজাজটা হল আসল মহারাজ!

জবরদস্ত স্টারডম তখন তার রীতিমত করায়ত্ত করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মানুষটি যে কী বিনয়ী, সেটার কোনও বর্ণনাই যথেষ্ট না। ব্যক্তি নির্বিশেষ তিনি অতি মিষ্টভাষী। এবং প্রত্যেকের সঙ্গে একইরকমভাবে ব্যবহার করতে যেন একদম বদ্ধপরিকর।

এটা জানা ছিল বলেই স্টুডিও ম্যানেজার দিব্যেন্দু আমাদের মিউজিক ডিরেক্টর অশোক ভদ্রকে কানে কানে বলল, যাও না দাদা, একবার রিকোয়েস্ট করে দেখো... আমার মনে হচ্ছে তোমার কাজ হয়ে যাবে! আসলে উদিতজী ওই স্টুডিওতে সেদিন এসেছিলেন কাঠমাণ্ডুর এক নেপালি মিউজিক ডিরেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে। একদম বাচ্চা একটি ছেলে। সে, একটি নেপালি লোকগীতির অ্যালবাম করাতে চায় উদিতজীকে দিয়ে। আমাদেরই মতো সঙ্গে করে ট্র্যাক তৈরি করে নিয়ে এসেছে। উদিতজী গানগুলো গেয়ে দিলেই তার কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু খুঁতখুঁতে উদিতজী নাকি রোজই স্টুডিওতে এসে ট্র্যাক শোনেন এবং বলেন, আরেকটু প্রস্তুতি নিয়ে তারপর তিনি গানগুলো গাইবেন। চার পাঁচদিন ধরে তাই ছেলেটি তার ল্যাং বোট হয়ে দিবারাত্রি মিছিমিছি শুধু ঘুরেই চলেছে।

এদিকে ওই একই স্টুডিওতে আমরা কলকাতা থেকে রেকর্ড করতে এসেছি বাংলা ছবির গান। জলি মুখার্জি, পূর্ণিমা, সাধনা সরগম, অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয় এবং কুমার শানুর গান ডাব হয়ে গিয়েছে। বাকি আছে শুধু একটি গান, যেটি সোনু নিগমের গাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি তখনও মুম্বাইয়ের বাইরে। এদিকে গানটি অবিলম্বে রেডি না হলে ছবির শ্যুটিং আটকে যাবে। তাই বিকল্প গায়কের সন্ধান চলছিলনই। সেরকম সময় হাতের কাছে উদিতজীকে পেয়ে সবারই মনে হল, একটা চান্স নিয়ে দেখতে ক্ষতি কী? অশোকদা আগেও কাজ করেছেন উদিতজীর সঙ্গে। সামনে গিয়ে হাজির হতেই সহাস্যে তার সঙ্গে হাত মেলালেন উদিতজী। কুশল সংবাদ বিনিময়ের ফাঁকে ঠাট্টার ছলেই জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাঁয়া দাদা? বাঙ্গাল মেঁ ডিমান্ড কম হোঁ গয়া ক্যাঁ হামারা? আজকল গানা নহিঁ মিঁল রঁহা?

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। অশোকদা তাই অবলীলায় বলটা ফ্রন্ট ফুটে খেলে দিলেন। বললেন, এমন অপবাদের একটাই উচিৎ জবাব হয়। আপনাকে এক্ষুনি একটি বাংলা গান গাইতে ইনভাইট করা। কিন্তু আপনি কি এখন অ্যাভেলেবল আছেন?

উদিতজী ভ্রু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন। তারপর বললেন, আমায় আটটার ফ্লাইট ধরতে হবে চেন্নাই যেতে। তার আগে হয়ে যাবে না?

প্রায় এক লাফে অশোকদা রেকর্ডিং রুমে ঢুকে হারমোনিয়ামের বেলো খুলে বসে পড়লেন। মিটিমিটি হাসি মুখে ঝুলিয়ে উদিতজীও অনুসরণ করলেন তাকে। আর আমি দেখলাম, দরজার কাছে দাঁড়ানো সেই নেপালি সংগীত পরিচালকের নিচের চোয়ালখানা বিলকুল ড্রয়ারের মতো খুলে হাঁ হয়ে গেল। অশোকদার মিউজিক অ্যারেঞ্জার বাপি, আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। কানের কাছে ফিসফিস করে সে বলল, হয়ে গেল বেচারির। আরও যে কতদিন উইকেট কামড়ে ওকে বম্বেতে পড়ে থাকতে হবে, কে জানে!

দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল, গানের রিহার্সেলে। সাদা কাগজে বড় বড় করে রোমান হরফে গানের বাংলা কথা লিখে নিয়েছেন উদিতজী। সুর আর উচ্চারণ শিখতে শিখতে নিজের মতো করে নোট লিখছেন সেই লেখার পাশে পাশে। আর অশোকদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটু একটু করে গানটা তুলে নিচ্ছেন। এর মধ্যে হঠাৎ তার সেলফোন বেজে উঠল। আর সে স্ক্রিনের দিকে তিনি তাকাতেই এতক্ষণে এই প্রথম দেখলাম, তার মুখের হাসি কয়েক সেকেন্ডের জন্য মুছে গেল। বদলে সেখানে ফুটে উঠল একটা দুশ্চিন্তার ছায়া। তার ঈষৎ বিড়ম্বিত পরবর্তী স্বগতোক্তিতেও সেই দুর্ভাবনারই ইঙ্গিত, হে ভগবান! ইসকোঁ অঁব ক্যাঁয়া বলুঁ ম্যায়ঁ?

অশোকদার দিকে মুখ ফিরিয়ে উদিতজী অনুমতি চাইলেন, এক্সকিউজ মি দাদা... কল ফ্রম চেন্নাই। থোঁড়া লে লুঁ?

অশোকদা সম্মতি জানাতে, খুব বড় করে শ্বাস টেনে যেন এক প্রস্থ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। দেখলাম, তার মুখের ট্রেড মার্ক হাসিটি তিনি আবার ফিরিয়ে এনেছেন। অর্থাৎ, পাবলিক ফিগার উদিত নারায়ণ সব সময় এই মুড বজায় রেখেই কথোপকথনে অভ্যস্ত। এবার ফোনটা রিসিভ করে যথারীতি মিঠে স্বরে তিনি শুরু করলেন, হ্যালুউউ স্যার... সো সরি টু সে... আই হ্যাভ...

এইটুকু বলেই আচমকা ব্রেক কষলেন তিনি। তারপর চোখ বুঁজে ঠোঁট চেটে নিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল, তার মতো ভালমানুষকে নির্জলা মিথ্যে বলার আগে নিজেকেই নিজের ঠেলা মারতে হয়। কয়েক সেকেন্ড এভাবে টানাপোড়েনে ভোগার পর তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে এক সময় চোখ কান বুঁজে বলে দিলেন, আয়ম সো সরি টু কিপ ইউ ওয়েটিং স্যার। বাট আই হ্যাভ... মিসড দ্য ফ্লাইট এগেইন।

এর পরবর্তী কথোপকথন বিশদে না বললেও চলে। 'মিসড দ্য ফ্লাইট এগেইন' বলার অর্থ হচ্ছে, এই কাল্পনিক ফ্লাইট মিস কাহিনি ইতিপূর্বে অন্ততঃ একবার তো বলেই সেরেছেন উদিতজী। ফলে টেলিফোনের ওপাশের ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই চূড়ান্ত হইচই জুড়ে দিয়েছেন এবার। আর উদিতজী তাকে শান্ত করার জন্য বার বার বলতে লাগলেন, পরের ফ্লাইট ধরেই তিনি যাবেনই যাবেন। এখুনি টিকিটের ব্যবস্থা করছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফোন পর্ব সাঙ্গ হতেই দেখা গেল আমার অনুমান মিথ্যে নয়। উদিতজী বুক পকেট থেকে একগাদা প্লেনের টিকিট বের করে দেখালেন আমাদের। যা দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! সন্ধে সাতটা থেকে রাত বারোটা অবধি আজকের চারখানা চেন্নাই ফ্লাইটের টিকিট উনি আগে থেকেই কেটে বসে আছেন। এমনকি কাল ভোরের প্রথম ফ্লাইটের টিকিটও কাটা রয়েছে ওই বান্ডিলে কাজ শেষ করার পর যে ফ্লাইটখানা ধরতে পারবেন, তাতেই তুরন্ত চেন্নাই রওয়ানা হবেন। কথা যখন একবার দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সে কথায় নট নড়নচড়ন!

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কিন্তু কাঠমাণ্ডুর এই মিউজিক ডিরেক্টর? এ বেচারা যে অকূল পাথারে পড়ল? ওকে কোনও কথা দেননি বুঝি?

উদিতজী মৃদু হেসে বললেন, ও জানে, নেপালের জন্য উদিত নারায়ণ কখনও তাড়াহুড়ো করে গান গাইবে না। কারণ, ওখানের ফ্যানরা সারা বছর অপেক্ষায় থাকে আমার অ্যালবামের জন্য। আর সেখানে সুরের যদি এক চুল এদিক ওদিক হয়েছে তো সব ছ্যা ছ্যা করবে। আই ক্যানট টেক দ্য রিস্ক অফ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং দেম!

এটা শুনে কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন, তাহলে নিশ্চয় সেদিন বাংলা ছবির গানের

বেলায় সে দরদ দেখাননি উনি। যেহেতু চেন্নাই রওয়ানা হওয়ারও তাড়াহুড়ো ছিল! কিন্তু না। স্বচক্ষে দেখলাম, সে ব্যাপারেও একেবারে নৈব নৈব চ! সেটা ডিজিট্যাল রেকর্ডিং-এর একদম প্রথম যুগ। ওই স্টুডিওতে রেকর্ডিং হচ্ছিল প্রো-টুলস নামক অতি আধুনিক সফটওয়্যারে। চাইলেই তাতে কণ্ঠস্বরে বিভিন্ন রকম কারিকুরি করার উপায় রয়েছে। আগের গানগুলোতে কোনও কোনও গায়ক যখন এক দু' জায়গায় সুর লাগাতে পারছিলেন না, তখন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে অবলীলায় নির্দেশ দিচ্ছিলেন, ওহে, প্রতুলবাবুকে দিয়ে অটো টিউন করে নিও এই জায়গাটা...।

কিন্তু উদিতজীর বেলায় তেমন হওয়ার কোনও উপায় নেই। মাইক্রোফোনের সামনে প্রায় দু' ঘণ্টা সময় নিয়ে গোটা গানটা উনি আগাপাশতলা রেকর্ডিং করলেন পাক্কা তিনবার ধরে। তিনটি সম্পূর্ণ আলাদা ট্র্যাকে। এরপর, রাত দুটো নাগাদ মিক্সিং কনসোলে এসে হাসি হাসি মুখে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লেন। শুরু হল আরেক পর্ব। উনি গানের এক একটি লাইনের তিনখানা আলাদা ট্র্যাক মন দিয়ে পরপর শুনছেন আর দরকার মতো সার্জারি করছেন। অর্থাৎ কোনও শব্দের প্রথম অক্ষর এক নম্বর টেক থেকে, তো বাকি অংশ তিন নম্বর টেক থেকে... এক পা এক পা করে এভাবে এগনো। আমরা কেউ কেউ মাঝে মধ্যেই ঘুমে ঢুলে পড়ছিলাম। কিন্তু উদিতজীর এনার্জি অফুরন্ত। আরও প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে কাট পেস্ট করতে করতে তিন ট্র্যাক থেকে এক ট্র্যাকে এনে গানকে দাঁড় করালেন উনি। না, গলার সুরে সেখানে একবিন্দু কোনও ডিজিটাল কারচুপি নেই। উদিতজীর ভাষায়, মে বি বিট বাই বিট, বাট আলটিমেটলি দ্য রিয়েল উদিত নারায়ণ, ফ্রম টপ টু বটম।

উনি যখন সবাইকে গুডবাই জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, সকালের আলো ফুটতে তখন খুব বেশি দেরি নেই। আমি জানি না, ভোরের ফ্লাইটটা সেদিন শেষ অবধি উনি ধরতে পেরেছিলেন না মিস হয়েছিল। শুধু এটুকু জানি যে রাতের গুরুপাক ডিনারটি কিন্তু আমাদের সবার পেটেই প্রোসেসড হয়ে গিয়ে তখন ছুটছিল পরিপাক প্রক্রিয়ার অন্তিম ইস্টিশন অভিমুখে। উদিতজী বিদায় নিতে না নিতেই তাই স্টুডিওর দু'খানা টয়লেটে ভোররাতেই লাইন। হাই তুলতে তুলতেই শুরু হল আরেকটা দিন। এবং সে যাত্রার জন্য সাঙ্গ হল, আমার বলিউডের প্লে ব্যাক সিঙ্গিং চাক্ষুষ দেখার অভিজ্ঞতা!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

যে দীপগুলি নিভে গেল

কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত এই অক্টোবরে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অনন্তলোকে যাত্রা করেছেন। আদতে ধূপগুড়িতে ছিল তার বসত, তার পূণ্যভূমি, বিচরণ ক্ষেত্র। তার শরীরে লেগেছিল উত্তরবঙ্গের গন্ধ-বর্ণ। কবিতায় তার নিজস্বতা, তার ভাবনা, অনুভব আকাশ ছুঁয়ে যায়। তাকে নিয়ে আড্ডাঘরে গত ৩০ অক্টোবর এক আলোচনায় কবি শেখর কর ভারাক্রান্ত মনে সেই নিজস্বতার কথা বলছিলেন।

স্ত্রী বিয়োগের পর একাকিত্ব বোধের সঙ্গে শরীরটাও দ্রুত ভাঙছিল। কলকাতায় পিজি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে তার চিকিৎসা হয়েছিল কিছুদিন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যে ওযুধপত্র তার খাওয়ার কথা তা তিনি উপেক্ষা করলেন। শেখরবাবু একরকম ধরে বেঁধে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি জীবনপ্রান্তে বেশ কিছুদিন কন্যা ও জামাতার কাছে জলপাইগুড়িতে বাস করছিলেন। মন পড়ে থাকত ধূপগুড়িতে, ওনার একান্ত স্বজন মানুষেরা ছড়িয়ে আছেন ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে। উনি লেখার ব্যাপারে বা লেখা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেমন যেন অগোছালো ছিলেন। কিন্তু কোনও লেখা তৈরি হয়ে গেলে সেটাকে তিনি বেশ কিছুদিন যত্ননিয়ে বারংবার পড়তেন প্রয়োজন অনুভব করলে পরিবর্তন করতেন। লিটিল ম্যাগাজিনের প্রতি তার ছিল গভীর দুর্বলতা। লিটিল ম্যাগাজিনের কোনও অনামী সম্পাদক তার কাছে লেখা প্রার্থনা করলে কখনও ফেরাতেন না। বরঞ্চ তাদের সেই সৃষ্টির কাজে আরও শ্রম দেবার আহ্বান জানাতেন।

ধূপগুড়ি বইমেলার ব্যাপারে তার সাগর প্রমাণ উৎসাহ ছিল। কখনও নতুন প্রকাশকের স্টলে দাঁড়িয়ে পরিচিত জনদের বই কেনার কথা বলতেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ উমেশ শর্মা— জলপাইগুড়ি বইমেলায় একটি স্টলে তার লেখা বইয়ের পশরা সাজিয়ে ছিলেন। আমার মতো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন রঘুদা (পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত) বই বিক্রির জন্য উমেশদাকে উৎসাহ দিতে এবং ক্রেতা ধরে আনতে। সেদিন ওই স্মরণ সভায় শ্রদ্ধেয় উমেশ শর্মা রঘুদার সেই সহযোগিতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কবি

শুভ্র চট্টোপাধ্যায় তার প্রিয় রঘুদাকে নিরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর— আজকের নিরিখে এটা হয়ত প্রয়াণের বয়স নয়। তার সৃষ্টি স্তব্ধ হল। উত্তরবঙ্গের বনে বাদাড়ে, আদিবাসী গ্রামে, পাহাড়ি পথে ঘুরে বেড়ানোর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তার লেখায় স্পষ্ট। বামপন্থী চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছাপ তার লেখায় স্থান পেয়েছে। তবে রাজনীতি লালিত হত অন্তরে— রাজনৈতিক আনুগত্য বিচার করে তিনি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেননি। তিনি অক্লেশে খুকলুং বস্তিতে আদিবাসী গৃহস্থের দাওয়ায় বসে কাঁসার থালায় ডালভাত খেয়ে তৃপ্তি পেতেন।

উত্তরবঙ্গের আর একজন বিদগ্ধকবি ও সম্পাদক ধূপগুড়ি নিবাসী অমিত কুমার দে বলছিলেন 'পুণ্যশ্লোক লেখায় কবি এবং জীবন চারণেও একজন কবি। প্রতিটি কবিতা অপূর্ব সব ছবি তৈরি করেছে। কবিতায় একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর সংকেত ছিল— শেষে কবিতা কখনও হয়ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি।'

অমিতবাবু বলছিলেন তার নিজস্ব কিছু 'শব্দবন্ধ' পাঠকের মনে গভীর দাগ কেটে যায়। পড়তে পড়তে পাঠকও হারিয়ে যায়। মানুষটা মোটেই বাস্তববাদী ছিলেন না। তিনি ধূপগুড়িতে পরিশ্রম করে শিশুদের পড়াশোনার জন্য 'নালন্দা শিশু মন্দির' নামে এক বিদ্যালয় তৈরি করেন। সেই বিদ্যালয়ে যখন প্রচুর ছাত্রছাত্রী তখন তিনি এই স্কুল আর চালালেন না। বাস্তববাদী না হওয়ায় তাকে ভুগতে হল।

অসম্ভব ভাল স্কেচ করতেন। জীবনের প্রতি চরম উদাসিনতায় তার শিল্পকর্ম বা সাহিত্য সৃষ্টি সংরক্ষিত করেননি। স্কেচের ভেতর তার একান্ত ভোবনা, জীবনবোধ, প্রকৃতি আর মানুষ ফিরে ফিরে এসেছে।

কবি অমিত কুমার দে বলছিলেন— "পুণ্যশ্লোকদাকে দিয়ে তার জীবনকথা লিখিয়ে নিয়েছিলাম 'চিকরাশি' পত্রিকার জন্য। নিজের না পাওয়ার বেদনা ও ব্যর্থতার কথাই যেন লিখে গেলেন। সেই লেখাটি 'আমার ভুবন আমার কবিতা লেখার গল্প'-তে বলেছেন— 'আমাকে বিভ্রান্তির শেষ নেই, আমাকে বোঝার কৌশল হয়ত কারও জানা নেই। আসলে আমি একজন দুর্বোধ্য মানুষ। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নষ্ট হয়ে গেছি'।"

রঘুদার ভগ্নিসমা কবি অনিন্দিতা গুপ্ত রায় লিখেছেন— 'অন্তর্নিহিত এক বিষাদ আর হতাশা সরিয়ে স্পষ্ট লিখতে চেয়েছিলেন আনন্দ গান। কখনও মেদুর লিরিকাল—'

তোমার জন্য অলকাপুরী তোমার জন্য রথ,
কুটিল অভিসন্ধি তোমার কান ভাঙানো পথ,
ছলকলার পরম্পরায় আমার কি যায় আসে—
রাধার কাছে যাব বলে পা রেখেছি ঘাসে।

অনিন্দিতা বলছেন— মৃত্যুর সাধ্য কি তোমাকে মুছে দেয়? যতই তুমি অভিমান করে বল না কেন, 'ক্ষত-বিক্ষত এই কবিকে যান্ত্রিক শহরে একশো বছরের ঘুম দাও। মৃত্যুর পর আমি আর কখনও কবিতা লিখব না।' বলছেন— আমি বিশ্বাস করি না তুমি কখনও কবিতা লেখা বন্ধ করতে পার। না, পার না। তুমিই না লিখেছিলে— 'কত কথা চমৎকার ঘুমিয়ে রয়েছে, কে তাকে জাগাবে আমি ছাড়া'।

শেষে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় বলেছেন 'ভাল থেকো রঘু ডাকাত'। রঘুদার বামপন্থী ভাবনার দোসর কবি ও সাহিত্যিক গৌতম গুহ রায় বলছিলেন— 'উনি আমার অন্তরে বাস করেন। একটা সহজ সরল মানুষ তিনি যথার্থই নাগরিক কবি। কিন্তু প্রান্তিক মানুষদের জন্য তার চিন্তাভাবনা, সহমর্মিতা বহুদিন স্মৃতিতে ভাস্বর থাকবে। কোনও এক বনবস্তীতে বা প্রত্যন্ত গ্রামে এক লোকশিল্পী হয়ত অসুস্থ বা বিপদগ্রস্থ, তিনি অবিলম্বে ছুটে গেছেন ভালবাসার হাত বাড়িয়েছেন। নিজেকে সম্ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার কোনও বাসনা কোনওদিন ছিল না তাই তিনি হয়ে ওঠেন মানবিক মুখ।'

গৌতম আরও বললেন— 'আমাদের মধ্যে বয়সের যথেষ্ট ফারাক থাকা সত্ত্বেও উনি ছিলেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু। গল্প আড্ডায় একসাথে বহু সময় কেটেছে। সে সব স্মৃতির মণিমুক্ত আমার মতো অনেকে সযত্নে অন্তরে লালন করবে।

রঘুদা, চলে গিয়েও তোমার মুক্তি নেই— বারবার উত্তরের সাহিত্য কর্মীরা তোমায় টেনে আনবে তাদের সব আলোচনায়, বিতর্কে, আড্ডায়।

কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার বারীন ঘোষাল

২৯ অক্টোবর ২০১৭ সকালে কবি ও সাহিত্যিক গৌতম গুহরায়ের পোস্টে জেনেছি কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার বারীন ঘোষাল প্রয়াত হয়েছেন, আগের রাতে। ওনার জন্ম আগরতলায় ৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪ সালে। আদিবাড়ি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলায়। বাস করেছেন ঝাড়খন্ড রাজ্যের জামশেদপুরে। তবুও অক্লেশে বলেন— 'ডুয়ার্স আমাকে কবি করেছে'। তার স্কুলশিক্ষা জামশেদপুরে, কলেজ কলকাতা এবং জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। পেশায় ছিলেন টাটা মোটরর্স-এর উচ্চপদের ইঞ্জিনীয়ার। সেই যে জলপাইগুড়ি এলেন চা-বাগান, তিস্তা নদী আর বিস্তীর্ণ বন তাকে প্রবলভাবে আকর্ষিত করেছিল। নভেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বইমেলায় বারীনদা ও অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

হোস্টেলের ছাদ থেকে সোনালি-রুপোলি বরফের টোপর পরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত। সকালের সূর্যালোকে ঝলমল করত। সহজ সরল মানুষজন, নিরালা হোটেলের সামনে আড্ডা। রূপশ্রী বা রূপমায়া সিনেমা হলে রবিবার সকালে ইংরাজি সিনেমা দেখা। শহরটিকে ও শহর সংলগ্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে গভীরভাবে সম্মোহিত করেছিল। ভালবাসলেন ডুয়ার্সকে। তাই তো কলেজ জীবন শেষে বারবার ফিরে এসেছেন এই শহরে। তিনি তো জন্ম বোহেমিয়ান। ঘুরে বেড়িয়েছেন ডুয়ার্সের গ্রামে, চা-বাগানে, বনবাংলোয়।

কবিতা নিয়ে তার নানা ভাঙা-গড়ার কাজ। তিনি গতানুগতিকতায় সম্পূর্ণ বিরোধী। লিটিল ম্যাগাজিনের প্রতি তার গভীর অনুরাগ। তরুণ কবিদের তিনি স্নেহ ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সিস্টেমের বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষটি তাই অক্লেশে লিখতে পারেন— ‘কিন্তু আমি আমার সম্বন্ধে কিছু বলব না। রুচিতে বাধে। আমার কোনও ঢাক নেই। অন্যেরা বলবে। একটা কথাই বলব, আমি বাংলা কবিতাকে ডিরেইল করতে এসেছি। আমি কবিতার ভিলেন। এখন লোকজন বলছে আমি ছেলে ধরা। গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ছোট কবিদের ধরে বেড়াই। তুমিও সাবধানে থেকো।’

১৯৬৮ থেকে জামশেদপুরে প্রকাশ করেছেন ‘কৌরব’ পত্রিকা। এখন কৌরব-এর ১১৯ তম সংখ্যা প্রকাশের পথে। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন— ভাবনায় ছিল কবিদের কমিউন। সেই লক্ষ্যে পুরুলিয়া জেলায় ‘ভালো পাহাড়’ গঠন করেছিলেন। বাংলা কবিতা নিয়ে সর্বদা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। কবিতার সঙ্গে লিখেছেন গদ্য, প্রবন্ধ। তার ভ্রমণ পিপাসু মন ছিল লাগামহীন। বেড়াতে তার ছিল অদম্য আগ্রহ।

কলকাতা বইমেলায় তরুণ কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে লিটিল ম্যাগাজিনের স্টলে গভীর আড্ডায় মগ্ন থেকেছেন। সেদিনও তাকে দেখেছি বিজয়, অনিন্দিতা, তনুশ্রী, অলীক, সত্যম, গৌতম, পার্থদের নিয়ে জলপাইগুড়ি বইমেলার মাঠে হিম মাথায় নিয়ে গপ্পের আসর সাজিয়েছেন। কবি প্রবীর রায়ের বাড়ির সাহিত্য আড্ডায় বারীনদাকে দেখেছি তরুণ কবিদের কী অসীম মমতায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। উত্তরের তরুণ কবি অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় (অলীক) লিখেছেন বারীনদাকে স্মরণ করে—

শুধু মনে রাখ একটা জলপাই শহর ছিল বলে
কবি হতে আসিনি সেদিন,
তোদেরই শীতে সাথে ফোঁটা ফোঁটা
বারীন হয়ে গেছি।’

কবি সত্যম ভট্টাচার্য্য আড্ডাঘরে স্মরণসভায় গভীর বিষাদে বলছিলেন বারীনদার তরুণ কবিদের পাশে থেকে সহজে একাত্ম হয়ে যাওয়া। ডুয়ার্সের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাকে বারংবার এখানে টেনে এনেছে— তিনি যথার্থ হয়ে উঠেছিলেন ডুয়ার্সের মানুষ। সত্যম বলছিল— ‘কবির মৃত্যু হয় না, তিনি কালজয়ী হয়ে ওঠেন তার সৃষ্টিতে।’

উজ্জ্বল সেন অসময়ে

১৪ অক্টোবর মাঝ রাতে হোয়াটসঅ্যাপ-এ উজ্জ্বল সেন দুটো গান পাঠিয়েছিল আমাকে। অত রাতে গানগুলো আর শুনিনি। পরদিন সকালে অনুজপ্রতিম সঞ্জিত মহন্তর ফোন পেয়েছিলাম। দ্বিধার সঙ্গে ধরা গলায় জানাল ওই দিন ভোর ৪.৩০ মিনিটে উজ্জ্বল সেন আমাদের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে যাত্রা করেছেন। আমি স্তম্ভিত। গলায় কান্না আটকে। ধূপ আর ফুল নিয়ে তাকে শেষবার দেখতে শ্মশানে গিয়েছিলাম। শায়িত বেসমেন্টে, শান্ত, সমাহিত।

জলপাইগুড়িতে জন্ম, ৩ মার্চ ১৯৭৭। পিতা প্রয়াত উমাপদ সেন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের অশিক্ষক কর্মী ছিলেন। স্কুলের সামনেই বাড়ি। উমাপদবাবু বামপন্থী ভাবধারার মানুষ ছিলেন, মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য করতেন। তার তিন পুত্র। উজ্জ্বল মধ্যম পুত্র। শৈশব থেকে সামাজিক কাজের প্রতি ছিল আকর্ষণ। জেলা স্কুলে পড়াশোনা। স্কুলের পরেই বাঁধ, তার ওপারে বয়ে যায় তিস্তা নদী। তিস্তার চরে বাস করে কিছু ছিন্নমূল পরিবার। কখনও বর্ষায় তিস্তার জলে ভেসে যায় তাদের ঘরবাড়ি। তারা তখন গরুছাগলসহ আশ্রয় নেয় উঁচু বাঁধে। ওদের দেখে উজ্জ্বল কষ্ট পেত। কিন্তু সাহায্য করার সামর্থ ছিল না।

উজ্জ্বল সেন

জেলা স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে এই শহরের আনন্দচন্দ্র কলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা। তারপর হাই স্কুলের চাকরি নিয়ে মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে যাওয়া। উজ্জ্বলের মন পড়ে থাকে এই শহরে। জন্মস্থানের প্রতি ছিল তার অমোঘ আকর্ষণ। মুর্শিদাবাদ থেকে মন পালাতে চাইত। চাকরি পেয়ে গেল এবার জলপাইগুড়ির জেলা রেজিষ্ট্রি অফিসে। হার্টের কিছু সমস্যা ছিল। বুকে বসেছিল পেসমেকার।

মানুষকে সেবার তাগিদে, শহরের উন্নয়নের লক্ষ্যে সোশাল মিডিয়ার (ফেসবুক, হোয়াটস্ অ্যাপ) মাধ্যমে গড়ে তোলেন গ্রিন সিটি, জলপাইগুড়ি নামে একটা সংস্থা। বর্তমানে গ্রিন সিটিকে অনুসরণ করে প্রায় ষাট হাজার নাগরিক। অনুগামীদের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী, কিশোর ও তরুণ। গ্রিন সিটির ওয়ালে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট বের হলে— শত শত ফলোয়ার সাড়া দিতেন। প্রশাসন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে ছিল গভীর সম্পর্ক। কতরকম কাজে তিনি গ্রিন সিটিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাচ্চাদের পোশাক বিতরণ, অসহায় রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে খাতাবই প্রদান, ছোটদের নিয়ে ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার, রক্তদান শিবির পরিচালনা করা, ভগিনী নিবেদিতার ১৫০তম জন্মসনে বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি ইত্যাদি। হোয়াটস্ অ্যাপে একটি পোস্ট দিয়ে তিনি সদস্যদের মতামত জানতে চাইতেন এবং কর্মসূচি রূপায়ন করতেন। গভীর রাত পর্যন্ত সোশাল মিডিয়ায় তার ভূমিকা দেখা যেত। বাইক নিয়ে সারা শহরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছবি নিয়েছেন এবং গ্রুপে পোস্ট করেছেন।

অত্যন্ত জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন আর মানুষের কথা শোনাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। রাখীবন্ধনের দিন থানার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে খেটেখাওয়া মানুষদের হাতে গভীর মমতায় রাখী পরিয়েছেন। ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় আড্ডাঘরে পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, বারীন ঘোষাল ও উজ্জ্বল সেনের প্রয়াণে স্মরণসভা হয়েছিল। অনুভব করেছিলাম জেলার কবি সাহিত্যিক মহলেও তিনি অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। উজ্জ্বলকে গ্রিন সিটির সদস্যরা সামাজিক কাজের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখবে, সুদীর্ঘ সময়, এই প্রত্যাশা রাখছি। উজ্জ্বলের অশতিপর মাতা, তরুণী স্ত্রী, শিশুপুত্ররা, ভাইদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। আবার বলব, উজ্জ্বল রয়ে যাবে তার কাজের মধ্যে এবং অনুরাগীদের আগামী কর্মপ্রবাহে।

কালিঝোরা লোয়ার ড্যাম

পরিবেশগত ভারসাম্যের অভাবে ডুয়ার্স তরাইতেও প্রকৃতির বিরূপতা বাড়ছেই

প্রকৃতি তার নিজস্ব খামখেয়ালিপনায় চলে। কিন্তু প্রকৃতির চেয়েও অধিকতর মানুষের খামখেয়ালিপনা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নামে প্রকৃতিকে বন্ধনে আবদ্ধ করার খামখেয়ালিপনার পরিণতি হচ্ছে ভয়ংকর। পৃথিবীর জনমলগ্ন থেকেই ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, হড়কাবান, সুনামী, খরা, মেঘভাঙা বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে চলেছে আর প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির বিপর্যয়কে ঘিরে মানুষের মনে নানারকমের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক কারণে দুর্যোগ ঘটলেও বিপর্যয় কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে না। কিছু কিছু বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে মনুষ্য সৃষ্ট কারণে। ২০০১ সালে গুজরাটের ভুজে ভয়ংকর ভূমকম্প, ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে প্রলয়ংকরী সুনামী, ২০০৫ সালে কাশ্মীরে সর্বনাশা ভূমিকম্প, ২০০৬ সালে রাজস্থানের বারমের, ২০০৮ সালে বিহারে কোশী নদীর সর্বগ্রাসী বন্যা, ২০০৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় লায়লার তাণ্ডব, পশ্চিমবঙ্গে আয়লার সাঁড়াশি আক্রমণ, ২০১০ সালে কাশ্মীরের উপত্যকায় মেঘভাঙা বৃষ্টি, ২০১১ সালে সিকিমসহ উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িসব বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তীব্র ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটনা মৃত্যুর বার্তাবাহক ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহীরূপে মানুষের আতঙ্কের পারদকে ঊর্ধ্বগামী করে তুলেছে। এই আতঙ্ককে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে ২০০৮ সালের মে মাসে চিনের সিচুয়ান প্রদেশে তীব্র ভূমিকম্প, ২০১১ সালে জাপানের ফুকুসিমা দাইচির ভূকম্পন ও সুনামীজনিত কারণে পারমানবিক বিদ্যুৎ বিপর্যয়, ২০১০ সালে হাইতির ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটনার ফলে হাজার হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু।

ভূমিকম্প এবং ধ্বসপ্রবণ এলাকা হিসাবে পরিচিত দার্জিলিং পাহাড়। পাহাড়ে যেভাবে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে এবং গাছ কাটা হচ্ছে— তাতে ভবিষ্যতের বিপদের ইঙ্গিত বারে বারেই দেওয়া হয়। পুর নিয়ম অনুযায়ী পাহাড়ে তিনতলার বেশি বাড়ি তৈরি করা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই বহুতলও তৈরি হচ্ছে সেখানে। পাহাড়ে এই মুহূর্তে ১১.৫

মিটারের বেশি উচ্চতার বাড়ি করার নিয়ম নেই। বেশ কিছু বাড়ির মালিককে চিঠি পাঠিয়ে বেআইনিভাবে নির্মিত বাড়িগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে পুরসভা বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবস্থা নিলেও বহুকাল ধরেই বেআইনি নির্মাণ চলে আসছে, দার্জিলিং পাহাড়ে। ফলে ভূমিকম্প বা মেঘভাঙা বর্ষণে কোনওরূপ বিপর্যয় ঘটলে তার জন্য দায়ী থাকবে নিয়মবহির্ভূতভাবে গড়ে ওঠা বিল্ডিং। ১৯৫০ সালে দার্জিলিঙে একদিনে ৭০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে তিনদিন মিলিয়ে ২১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ৮০-র দশকে বৃষ্টির ফলে সমগ্র জলপাইগুড়ি ভেসে গিয়েছিল। তবে এরকম পরিমাণ বৃষ্টি ৪০-৫০ বছরে একবার হত। কিন্তু বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে যেভাবে নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা উপকূলীয় অঞ্চলসহ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলকে যেভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে তাতে দার্জিলিং পাহাড়ও বিপদসীমার মুখে দাঁড়িয়ে।

> প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই আসে বর্ষা আর বর্ষা মানেই ধ্বস, ভূমিকম্প প্রকৃতির রুদ্ররূপের তাণ্ডব। কিন্তু এই তাণ্ডবের পিছনে যে একশো শতাংশ দায়ী মানুষ এবং মানুষের সৃষ্ট আধুনিকতা তা আমরা মানলেও স্বীকার করতে চাই না। কোনও একটা প্রাকৃতিক অঘটন যখন ঘটে তখন লোকদেখানো কিছু যন্ত্রণা উপশমনাশক বটিকা গেলানো হয়, কিন্তু তাতে রোগ নির্মূল হয় না।

পিলিন, লহর, সুনামী, আয়লা, হুদহুদের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত উপকূলীয় অঞ্চল। ভূমিকম্পের আশংকায় ভীতসন্ত্রস্ত সিকিমসহ হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবাংলা। একদিকে সিকিম, অন্যদিকে ভুটান। পূর্ব হিমালয়ের একাধিক তুষার হ্রদ উত্তরবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্টই বিপজ্জনক। পাহাড়ের বহু উঁচু এলাকায় অবস্থিত এই হ্রদগুলির জলস্তর অদূর ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গ, অসম এমনকি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিপদের কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। ভুটানের উত্তরাঞ্চলে আছে অজস্র হিমবাহ এবং তুষার হ্রদ। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভুটানে রয়েছে ৬৭৭টি হিমবাহ এবং ২৬৭৪টি তুষার হ্রদ। হ্রদ ফেটে বিধ্বংসী বন্যার সম্ভাবনার দিক থেকে বিপজ্জনক হ্রদের সংখ্যা ৮২টি। বড় বিপদের আশংকা নিয়ে ৪৪০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে থরথরমি তুষার হ্রদ। এই হ্রদের পূর্বদিকে আছে র‍্যাপসট্রেংসোহো হ্রদ যা আছে থরথরমির ৭৪ মিটার নিচে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে পাহাড়ি এলাকায় হিমবাহ গলে যাওয়ার হার বাড়ছে প্রতিনিয়ত। থরথরমি হ্রদের আশপাশে থাকা বরফ প্রতি বছর ৩০ থেকে ৩৫ মিটার অর্থাৎ ১০০ থেকে ১৬০ ফুট করে গলে যাচ্ছে। ফলে হ্রদের আকার এবং জলের পরিমাণ বাড়ছে।

ডব্লিউডব্লিউএফের সমীক্ষা অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ২০০১ সালের তুলনায় থরথরমি হ্রদের আয়তন তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৪২ বর্গ কিমি। হ্রদে জলের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তাতে হ্রদের দেওয়ালের জল ধারণ ক্ষমতাও কমছে। ফলে বাড়ছে বিপদ। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কোনওভাবে হ্রদ ভাঙলে ভুটানের পুনাখা, ওয়াদি ইত্যাদি উপত্যকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ তো হবেনই, সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একাধিক রাজ্যের ক্ষতি হবে। সেই সঙ্গে ভুটানের একাধিক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মারাত্মক ক্ষতি হবে যার জেরে ভুটানের অর্থনীতির ওপরেও বড় আঘাত নেমে আসবে। থরথরমি হ্রদের নিচে র‍্যাপসট্রেং হ্রদ। জলস্তর বাড়লে কিংবা তুষার ধ্বসের ফলে কোনওভাবে এই হ্রদের দেওয়াল ভেঙে গেলে বিপুল পরিমাণ জল গিয়ে পড়বে র‍্যাপসট্রেং হ্রদে। দুটি হ্রদের বিপুল পরিমাণ জল আরও নিচে নেমে এসে পশ্চিমবঙ্গসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্য এমনকি বাংলাদেশেরও বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই আসে বর্ষা আর বর্ষা মানেই ধ্বস, ভূমিকম্প প্রকৃতির রুদ্ররূপের তাণ্ডব। কিন্তু এই তাণ্ডবের পিছনে যে একশো শতাংশ দায়ী মানুষ এবং মানুষের সৃষ্ট আধুনিকতা তা আমরা মানলেও স্বীকার করতে চাই না। কোনও একটা প্রাকৃতিক অঘটন যখন ঘটে তখন লোকদেখানো কিছু যন্ত্রণা উপশমনাশক বটিকা গেলানো হয়, কিন্তু তাতে রোগ নির্মূল হয় না। বহু বছর আগে থেকেই উত্তরবঙ্গের অন্যতম শক্তিশালী এবং সুপ্রাচীন আদি তিস্তাকে চারিদিক দিয়ে রুদ্ধ করে জলবিদ্যুৎ গড়ে তোলার যে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছিল, তা বারেবারেই পরিবেশবিদদের দ্বারা সমালোচিত হলেও কোনও ওজরআপত্তি না শুনেই ফেজ ১, ২, ৩ এবং ৪-এর কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়ে যেতে বসেছে দেড় দশকেই। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সেবক পাহাড়ের ধ্বস, তিস্তার প্রলয়ংকারী বন্যার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। গৌরচন্দ্রিকা না করে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করলে বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতিকে বাধা দেওয়ার, প্রকৃতির গতিশীলতাকে স্তব্ধ করার মানুষের অদম্য স্পৃহা যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনই আবার প্রকৃতিকে আপন করে তাকে বিজ্ঞানের কাজে লাগানোর স্পর্ধাও লক্ষ্য করা যায়। দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারলে তাই সমূহ বিপদ।

হিমালয়ের ১২ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে তিস্তা প্রবাহিত হয়ে প্রায় ১৭৫ কিমি পথ অতিক্রম করে নেমে এসেছে ৩০০ মিটার উচ্চতায়। তিস্তার এই দ্রুত অবতরণের সুযোগে দুই দশক আগে কেবল সিকিমের মধ্যেই কতকগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছিল। লাচানে উচ্চতম প্রকল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা ৩২০ মেগাওয়াট, ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় লাচান-লাচুং এ পাওয়া যাবে ৭৫০ মেগাওয়াট, ৬ হাজার ফুট উচ্চতায় চুংথাং-এ পাওয়া যাবে ১২০০ মেগাওয়াট, ৩ হাজার ফুট উচ্চতায় সিংঘিক-মঙ্গনে উৎপাদন হবে ৪৯৫ মেগাওয়াট, ৯০০ ফুট উচ্চতায় বরদং-রংপো-তে ৩৬০ মেগাওয়াট এবং তিস্তার প্রবাহ পাহাড় ছেড়ে প্রায় সমতলে নেমে আসার পরে এ রাজ্যে যে চারটি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে রম্ভিতে ১৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতার 'লো ড্যাম স্টেজ থ্রি' এবং আরও নিচে কালিঝোরায় ১৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার 'লো ড্যাম স্টেজ ফোর' প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছে। খরস্রোতা তিস্তার প্রবাহ কাজে লাগিয়ে সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাবনা চিহ্নিত করেছিল কেন্দ্রীয় জল কমিশন। প্রকল্পগুলিতে মোট ৪০২৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিক পর্বে তিনটিকে বেছে নিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন বা এন.এইচ.পি.সি.। পূর্ব সিকিমের দীপুদারা এলাকায় নির্মিত হয় ৫১০ মেগাওয়াটের 'স্টেজ ফাইভ' প্রকল্প। ২২৩৭ কোটি টাকার প্রকল্পটিতে পরবর্তীকালে ব্যয় আরও অনেক বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশবিদদের মতে, ন্যাশনাল হাইড্রোলিক পাওয়ার কর্পোরেশন বা এন.এইচ.পি.সি.-এর তিস্তা লো ড্যাম প্রজেক্ট স্টেজ ৩ এবং স্টেজ ৪ প্রকল্পে ১৩২ক মেগাওয়াট এবং ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হয়েছিল প্রকল্পের কাজ শুরুর আগেই লোকজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

হবে এবং বিকল্প কর্মসংস্কৃতিতে ব্যবস্থা করা হবে, অন্য স্থলে বসবাসের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে। বলা হয়েছিল প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনবেল্টেরও কাজ শুরু হবে। যেসব গাছপালা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল সেগুলি রোপণের ক্ষেত্রেও বিকল্প পদ্ধতি চিন্তাভাবনা করা হবে। কিন্তু আজও রম্ভিখোলা বা কালীঝোরায় গ্রিনবেল্টের কাজ হয়নি বলে পরিবেশবিদদের অভিযোগ। প্রজেক্ট সংলগ্ন অঞ্চলের 'এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট স্টাডি' এবং 'এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট স্টাডি যারা করেছেন সেই ভূতত্ত্ববিদ, পরিবেশবিদ এবং বনাধিকারিকেরা এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা, সমাজবিজ্ঞানী, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী, ভূবিশারদ, অর্থনীতিবিদ এবং প্রযুক্তিবিদেরা সদর্থক মতামত দিয়েছিলেন বলেই কাজটা সুসম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই ভূমিকম্প এবং ধ্বসপ্রবণ পাহাড়ি এলাকায় এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হলে পাহাড়ের গায়ে এই প্রকল্পের জলাধার, রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘর তৈরি হবে। ফলে ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা থাকতে পারে। এই নদী উপত্যকায় সম্ভাব্য ভূমিধ্বসের পরিমাপ এখনও করা হয়নি। এর সঠিক পরিমাপ জানার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এই অঞ্চলে পাহাড়ি এলাকার জন্য তৈরি হয়নি। এই অঞ্চলের নদীগুলির পলি পরিবহণ ক্ষমতারও সঠিক মূল্যায়ন হয়নি এখনও পর্যন্ত। পশ্চিম হিমালয়ের নদীগুলির চেয়ে এই অঞ্চলের নদীগুলি অনেক বেশি পলি পরিবহণ করে। ফলে নদীবাঁধের জলাধার তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে তার জলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে বাঁধের পরিকল্পিত স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতাও কমে যায় তিস্তায়, প্রচুর পরিমাণ পলি, পাথর এবং বালি আসে। তাই নিচে বাঁধ হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ে বাঁধের জলাধারের স্থায়িত্বও খুব বেশি হবে না। জলাধার তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে যাবে এবং এই অঞ্চলে ধসের সংখ্যা বাড়লে তার ফল ভয়াবহ হতে পারে। ৪০ মিটার জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা যেহেতু কম নয় তাই এই অঞ্চলে নিয়ত পরিবর্তনশীল অসংখ্য চ্যুতিযুক্ত ভূস্তরের উপরে এই বিশাল জলাধারের জলের চাপের কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা নেই কারোরই। এই ধরনের পাহাড়ি অঞ্চলে এই ধরনের জলাধার নির্মাণের ফলে ভূমিকম্পের সংখ্যাবৃদ্ধি মোটেও অসম্ভব নয়।

তিস্তা প্রকল্পের তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের বাঁধদুটির ক্ষেত্রে বলা যায় এত খরচ করে এইরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভাবা প্রয়োজন। অচিরাচরিত শক্তির উৎপাদন করেও এই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা উচিত। সেই সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উত্তরবঙ্গের ক্ষতি করে কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ বা বিহারে না পাঠিয়ে এই বিদ্যুৎ এখানেও খরচ করা যেতে পারে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের নদীগুলি থেকেই ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুৎ এবং তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুপাতগত পার্থক্য এতটাই বেশি যে, প্রয়োজনের সময় 'পিক আওয়ারে' আচমকা সৃষ্টি হওয়া বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয় না বলে গ্রিড ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। কয়লার মতো খনিজ পদার্থের যোগানের অভাব দেখা দিলে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যহত হতে পারে বলে তিস্তার স্বাভাবিক জলধারাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও উন্নত করা যাবে। উত্তরবঙ্গে তিস্তা নদীর জলধারাকে কাজে লাগিয়ে সহজেই প্রচুর পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন এলাকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করবার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তারই অঙ্গ হিসাবে দার্জিলিং জেলার কালিম্পংয়ের কাছে রম্ভিতে তিস্তা নদীর উপর বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলাতে ১৮৯৭ সালে ১৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হওয়ার পর বিগত এক শতকে উত্তরবঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সেভাবে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ এই রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিস্তার এই প্রকল্প উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে বলে আশা করা যায়। পরিবেশকে নষ্ট করে না বলেই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের চাহিদা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। উত্তরবঙ্গে এইসব জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক বিকাশ এবং অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসবে। সকাল এবং সন্ধ্যায় বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সাহায্যে মেটানো সব সময় সম্ভব হয় না বলে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশেষভাবে উপযোগী।

পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং মহকুমার রম্ভিখোলায় যে তিস্তা বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে পরিবেশ ব্যপক মাত্রায় দূষিত হওয়ার আশংকা তখনই প্রকাশ করেছিলেন ভূবিদ, পরিবেশবিদ, ভূতাত্ত্বিক প্রমুখ। হিমালয়ের মতো এক অতি নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালায় বৃহত্তর নদীবাঁধ তৈরির বিপজ্জনক দিকগুলি ভাল করে সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন। হিমালয়ের ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণি উচ্চতায় একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক শক্তিসমূহ কাজ করে চলেছে। এবং হিমালয়ের নিয়ত ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এর ফলে হিমালয় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভূকম্পপ্রবণ অঞ্চল। হিমালয় অঞ্চলে ভূত্বকের গভীরে নিয়ত ভূখণ্ডীয় সংঘর্ষ হচ্ছে এবং তাঁর ফলে ভূ-অভ্যন্তরে বিপুল যে শক্তি জমা হচ্ছে এখন তা রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও সময়ে তা মহাবিপর্যয় সৃষ্টিকারী ভূমিকম্প সৃষ্টি করে ভূ-অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এই নির্মীয়মান বাঁধের যে অবস্থান ঠিক করা হয়েছে তা কুমাই বা মূর্তি নদী অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলে অনেক ফল্ট বা চ্যুতি আছে যার সমবেত ফল ভূমিকম্প। এই অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ বলে প্রবল ভূকম্পে বাঁধ দুটির একটিও ভেঙে গেলে বাঁধের জমা জলে তিস্তা নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল ভেসে যাবে। ভূকম্পে দুটো বাঁধ যদি একসঙ্গে ভেঙে যায় তাহলে ভয়ংকর বন্যায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পে বলা হয়েছে করোনেশন ব্রিজের প্রায় আধ কিলোমিটার উজানের চতুর্থ পর্যায়ের বাঁধটি লম্বায় প্রায় ২০০ মিটার এবং উচ্চতায় নদীখাত থেকে প্রায় ৪০ মিটার। এতে যে জলাধার গড়ে উঠবে তাতে জলে ডুবে যাবে প্রায় চারশো হেক্টর জমি। তৃতীয় পর্যায়ের বাঁধে জলমগ্ন হবে প্রায় ২০০ হেক্টর জমি। অন্যান্য কাজে নষ্ট হবে প্রায় সওয়া তিনশো হেক্টর জমি। অর্থাৎ মোট প্রায় সোয়া পাঁচশো হেক্টর জমি নষ্ট হবে। আনুমানিক হাজার হেক্টর বিনষ্ট পাহাড়ি জমির মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ বনাঞ্চল।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে করা 'এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাকড স্টাডি' এবং 'এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট স্টাডি' অনুযায়ী জানা গিয়েছে, যেহেতু হিমালয় একটি নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা তাই বৃহত্তর নদী বাঁধ প্রকল্পগুলির বিপজ্জনক দিকগুলিও সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। হিমালয়ের ভঙ্গিল শ্রেণি উচ্চতায় একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হিমালয় ক্রমেই ভূকম্পপ্রবণ জোন হয়ে উঠছে দিন দিন। শিলিগুড়ি থেকে ৪২ কিমি দূরে জাতীয় সড়কের ধারে ২৭ মাইলে গড়ে উঠেছে রম্ভি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। প্রকল্পটি তিস্তাবাজার থেকে ৭ কিমি দূরে। প্রকল্পটি কীভাবে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত ছাড়পত্র পেল, সেটা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে ২৭ মিটার উঁচু ব্যারেজ, সাতটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

টিলার করা হয়েছে। ব্যারেজের পাশাপাশি কলোনী তৈরি হয়েছে। ব্যারেজের ওপরের ২২০ মিটার রাস্তা নদীর দু'পারের পার্বত্য এলাকায় গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ করে তুলবে। ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট ছাড়পত্র প্রদান করেছে। পরিবেশ এবং বনদপ্তরও ছাড়পত্র প্রদান করেছে।

তিস্তা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। পরিকল্পনা মতো সবকিছু ঠিকঠাক চললে তৃতীয় পর্যায়ের বাঁধের ফলে প্রায় ১৩২ মেগাওয়াট এবং চতুর্থ পর্যায়ের বাঁধের ফলে প্রায় ১৬৮ মেগাওয়াট অর্থাৎ মোট প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে। তিস্তা নদীর জলধারাকে কাজে লাগিয়েই রম্ভি এবং কালিঝোরার এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এ রাজ্যে যে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হবে তার শতকরা ১২ ভাগ বিদ্যুৎ বিনামূল্যে রাজ্য সরকার পাবে। রম্ভিতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পাশাপাশি তিস্তা— বোটিং, ইকো টুরিজমের আদর্শ স্থান হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশ ঘটবে। এন.এইচ.পি.সি. বা হাইডেল প্রজেক্টের উদ্যোগে রম্ভি এবং কালিঝোরাতে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হবার ফলে সেখানে যাতায়াত অনেক সহজসাধ্য হবে। পর্যটকরা সহজেই ওই এলাকায় যেতে পারবেন। ফলে এই এলাকায় আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হবে। এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসাবাণিজ্য হবার ফলে পুরো এলাকার চালচিত্র দ্রুত বদলে যাবে।

প্রযুক্তিবিদদের বৃহত্তর অংশই বিশ্বাস করেন বৃহৎ নদীবাঁধ দিয়ে বহুমুখী বৃহত্তর অংশই বিশ্বাস করেন বৃহৎ নদীবাঁধ দিয়ে বহুমুখী বৃহত্তর নদী পরিকল্পনা করা হলে জনগণের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হবে। তাই বিশাল এবং বহুমুখী নদী পরিকল্পনার কাল্পনিক চিত্র অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবের রুক্ষ জমিতে আছড়ে পড়ে। জনগণ রঙিন স্বপ্নের বাস্তব চিত্রণ দেখার আশায় হাজার হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনার ব্যাপারে কিছু না বুঝেই বাহবা দিলেও কিছুদিন পরে প্রযুক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। রঙিন স্বপ্নের ফানুস উড়িয়ে যারা কাজ গুছিয়ে নেন তাদের পরিকল্পনাগুলির সামগ্রীক বাস্তবায়ন খুবই কঠিন কাজ সাময়িক লাভের আশায় বৃহত্তর সমস্যাকে অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়। প্রাণীবিদ, উদ্ভিদবিদ, রসায়নবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী, ভূ-বিশারদ, অর্থনীতিবিদ এবং একাংশ প্রযুক্তিবিদের মতে কালিঝোরাতে নির্মীয়মান বাঁধের অবস্থান মূর্তি নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অনেক ফল্ট বা চ্যুতি আছে যার সমবেত ফল ভূমিকম্প। প্রবল ভূমিকম্পে কোনও কারণে বাঁধ ভেঙে গেলে বাঁধের জমা জলে তিস্তা নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যদি ভূকম্পে 'রম্ভি স্টেজ থ্রি' এবং 'কালিঝোরা স্টেজ ফোর' এর দুটি বাঁধই ভেঙে যায় তাহলে ভয়ংকর বন্যায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হবে।

উত্তরের তিস্তা নদীর পাহাড়ি অববাহিকার তিস্তা প্রকল্পের তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের কাজের অংশ হিসাবে গৃহীত বৃহত্তর নদীবাঁধ প্রকল্পে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার লোকজনকে সরিয়ে বিকল্প পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যে সব গাছপালা বিনষ্ট হবে সেগুলি রোপণের ক্ষেত্রেও 'গ্রিনবেল্টের কাজ' শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করার চিন্তাভাবনাও পরিবেশবিদদের আছে বলে জানা গিয়েছে। সম্ভাব্য ভূমিধ্বসের পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। নদীগুলির পলি পরিবহণ ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ণ, বাঁধের পরিকল্পিত স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতার সঠিখ মূল্যায়ণ দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের নদীগুলি অনেক বেশি পলি পরিবহণ করে বলে নদীবাঁধের জলাধার তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে তার জলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তিস্তায় যেহেতু প্রচুর পরিমাণ বালি, পাথর এবং পলি আসে তাই নিচু বাঁধ হলে বাঁধের জলাধারের স্থায়িত্ব খুব বেশি হবে না। জলাধার তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে গেলে তার ফল ভয়াবহ হতে পারে। এই অঞ্চলে নিয়ত পরিবর্তনশীল ভূস্তর অধ্যুষিত অঞ্চল বলে ভূমিকম্পজনিত কারণে ৪০ মিটার গভীর জলাধার ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার ফল ভয়ানক হতে পারে।

একথা ঠিক প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে মংপু, তিস্তাবাজার বা কালিম্পং অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে। মংপুতে ৯০ একর জমিতে তৈরি হওয়া কলোনিতে আবাসন নির্মিত হবে, প্রকল্প রূপায়িত হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির চেহারাই পাল্টে যাবে। টুরিজমের কথা মাথায় রেখে র‍্যাফটিং, ওয়াটার গেমস, সুইমিং, মৎস্যচাষ প্রকল্প ইত্যাদির পরিকল্পনাও রয়েছে। এলাকার পরিবেশ সুরক্ষার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। সিকিমের পথে যেতে জাতীয় সড়কের লাগোয়া অঞ্চলে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে ওই এলাকায় ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠবে, সমগ্র এলাকার চালচিত্র দ্রুত বদলে যাবে। তাই পরিবেশগত ভারসাম্য রেখে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

গৌতম চক্রবর্তী

বন্যপ্রাণ চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধনে
শিলিগুড়িতে সব্যসাচী

‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকার সৌজন্যে শিলিগুড়িতে ব্যতিক্রমী একটি বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির ওপর চিত্র প্রদর্শনী হল। শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রের রামকিঙ্কর হলে অক্টোপিকের উদ্যোগে রবিবার ২৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয় বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির ওপর এক চিত্র প্রদর্শনী। পরদিন সোমবার পর্যন্ত সেই প্রদর্শনী চলে। রবিবার বিকালে সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন

করেন ফেলুদা খ্যাত প্রখ্যাত অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। সব্যসাচী নিজেও ছবি তুলতে ভালবাসেন। আর সেই ছবি হল বন্যপ্রাণীর ওপর। তাই এই ধরনের প্রদর্শনীতে আসতে পেরে এদিন তিনি বেশ খুশি। তার সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলি। সব্যসাচী চক্রবর্তী সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে বলেন, এই ধরনের প্রদর্শনীর মূল কথাই হল, সচেতনতা বাড়ানো। আর সেক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতির ওপর যথেচ্ছাচার চালিয়ে আমরা যদি প্রকৃতিকে আমাদের ড্রয়িং রুমে নিয়ে আসি বা ডিস্কো হিসাবে পরিণত করি তবে প্রকৃতিও উল্টো কাজ করতে শুরু করবে। বাড়তে থাকবে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি বা ভূমিকম্প বা ঝড়। আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করতে থাকলে প্রকৃতিও তার পাল্টা প্রতিশোধ নেবে।

গাজলডোবাকে পিকনিক স্পট হিসাবে পরিণত করার প্রসঙ্গ তোলার পাশাপাশি ফুলবাড়ির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন সব্যসাচী। তিনি বলেন, ফুলবাড়িতেও দূষণ শুরু হয়েছে। থার্মোকল, প্লাস্টিক ব্যবহারের সঙ্গে সেখানে শব্দ দূষণ হচ্ছে প্রচণ্ড। তাই সচেতন হওয়া জরুরি। এদিন শিলিগুড়িতে সব্যসাচী আসেন নাটক করতে। সেই সময়ই তিনি ওই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। তার সুরে সুর মিলিয়ে অরিন্দম গাঙ্গুলি বলেন, আজ দূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এই প্রদর্শনীতে ৯৩ জন অংশগ্রহণ করেছেন, ছবি এসেছে ৪৪৬টি। প্রদর্শিত হয়েছে ৮২টি ছবি।

বাপি ঘোষ

জলপাইগুড়িতে কিছু
হিরন্ময় নাট্যসন্ধ্যা

স্তানিশ্লাভস্কি শুধু একজন বড় মাপের অভিনেতা, পরিশীলিত চিন্তক, কিংবা মহৎ নাট্যকারই নন, তিনি ছিলেন নাট্যকলার এক বিশ্বজনীন নীতির প্রণেতা ও আধুনিক অভিনয়-বিজ্ঞানের স্রষ্টা। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি হলেন নাট্যকলায় এক নির্দিষ্ট ঘরানার সৃজক। নাট্যকলায় তিনিই একক ব্যক্তিত্ব, যিনি, ব্যক্তির ব্যবহারিক বস্তুগত রীতিতে মঞ্চে অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। একমাত্র তিনিই অভিনেতা সচেতন স্তর থেকে কীভাবে অবচেতন স্তরে প্রবেশ করবে, তার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। শারীরবিদ্যায় পাভলভ যে কাজটি করেছেন নাট্যকলায় ঠিক সেই কাজটিই করেছেন এই মানুষটি। থিয়েটার বিভিন্ন রকম ধারা, ঝোঁক বা বিন্যাস নিয়ে অজস্র পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে কিন্তু স্তানিশ্লাভস্কির মতে— ‘আসলে এতে মোদ্দালাভ আমাদের কিছুই হয় না। কারণ অভিনয়ে চরিত্রের মধ্যে বাস করার ক্ষেত্রে একজন অভিনেতার প্রয়োজন যথার্থ অনুভূতি ও দক্ষতা প্রকাশের ক্ষমতা। এ শক্তি তখনই একজন অভিনেতা আনতে পারেন যখন তিনি পূর্ণমাত্রায় নিজেকে সঁপে দেন প্রকৃতির কোলে’।

স্তানিশ্লাভস্কির এই কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল বাংলাদেশের ঢাকা বটতলা নাটকের দলের একটি সাম্প্রতিক প্রযোজনা দেখতে গিয়ে। প্রথমেই বলে নেওয়া যাক বাংলাদেশের নাটকের প্রতি যে কোনও নাটক-প্রেমী দর্শকের মতো এই কলমচিও আশৈশব শ্রদ্ধাশীল। কাঁটাতারের বেড়ার কারণে ওঁদের প্রযোজিত মঞ্চনাটক দেখার তেমন একটা সুযোগ জোটে না সচরাচর। তবে ছোট থেকে আমরা অনেকেই বড় হয়েছি বাংলাদেশ টিভির নাটক দেখে দেখে। সংশপ্তক, এই সব দিনরাত্রি, ঢাকায় থাকি, অয়োময়-এর মতো ধারাবাহিক নাটক চাক্ষুষ করে আনন্দ নিয়েছি দিনের পর দিন। বহু যুগ বাদেও স্পষ্ট মনে আছে বৃহস্পতিবার করে হত সাপ্তাহিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। হুমায়ূন ফরিদি, আবুল হায়াত, আসাদুজ্জামান নূর, সুর্বণা মুস্তাফা, ফিরদৌসি মজুমদার, ডলি জহুরদের মনে হত ঘরের মানুষ। তাঁদের অভিনয় আমাদের চোখে আজও পরিয়ে রেখেছে মায়াকাজাল। এখন সেভাবে টিভি দেখা হয় না, তবুও হুমায়ূন ফরিদির লিগাসি যিনি বহন

ক্র্যাচের কর্নেল নাটকের দৃশ্য

ক্র্যাচের কর্ণেল নাটকের দৃশ্য

করছেন সেই মোশারফ করিমের মতো পছন্দের কয়েকজনের দিকে সাগ্রহে নজর রাখি ইউটিউবে।

মধ্যরাতের কুমারী শরীর ছিঁড়ে হেমন্তের আকাশ ভেঙে শীত নামছে এখন ডুয়ার্স জুড়ে। আর কে না জানে হেমন্ত হল কবোষ্ণ শীতের সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার কিছু নাটক দেখার মরশুম। এহেন সহসা দৈবের বশে জলপাইগুড়ির প্রয়াস প্রেক্ষাগৃহে ঢাকার বটতলা নাট্য সংস্থা প্রযোজিত মহম্মদ আলি হায়দার নির্দেশিত নাটক 'ক্র্যাচের কর্ণেল' দেখার সৌভাগ্য হল সেদিন। স্থানীয় বান্ধব নাট্য সমাজের সৌজন্যে। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, টানা দু'ঘণ্টা আক্ষরিক অর্থে হাঁ করে দেখে গেলাম সৌম্য সরকার, সামিনা লুৎফাদের এই অসামান্য প্রোডাকশন। মুক্তিযুদ্ধের পর রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নিয়ে চলে ষড়যন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধে যিনি নিজের পা খুইয়েছিলেন সেই কর্ণেল তাহেরকে অন্যায়ভাবে কোর্ট মার্শাল করে ফাঁসি দেওয়া হয়। সেই কাহিনি নিয়ে যেমন টানটান এই নাটক তেমনই জমজমাট প্রত্যেকের অভিনয়। দশজন অভিনেতা দাপিয়ে বেড়ালেন মঞ্চ জুড়ে। এলিয়েনেশনের এমন প্রয়োগ আমি অন্তত আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় দেখিনি। অভিনেতারা গোটা নাটক জুড়ে বার বার ইল্যুশন তৈর করছিলেন আর মোক্ষম সময়ে এসে সেই ঘোর ভেঙে দিচ্ছিলেন।

ঢাকা বটতলা নাট্য সংস্থার এই প্রযোজনা দেখে স্তানিশ্লাভস্কির কথাই মনে হচ্ছিল বারবার। এক একজন অভিনেতা নাটকের সময় বিভিন্ন শেডের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। একটি চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে নিজেকে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছিল বাচনভঙ্গী, শরীরী ভাষা। স্তানিশ্লভস্কি যেমন চেয়ে এসেছিলেন তেমনই 'অভিনয় চরিত্রের মধ্যে বাস করতে পারা'-র কৌশল তাঁদের করায়ত্ত। ফলে যে কাহিনিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে 'ক্র্যাচের কর্ণেল' নাটকের শরীর সেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে এই বঙ্গের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ততটা ওয়াকিবহাল না হলেও নাটকটি উপভোগ করার ক্ষেত্রে সেই অনভিজ্ঞতা অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। আলোর পরিকল্পনা ও প্রয়োগ এবং আবহ সংগীত অসম্ভব ভাল। খুব সুন্দর রূপসজ্জার কাজ করেছেন শেউতি শাহগুফতা। এঁদের টিমওয়ার্কের ফসল ফলেছে। ফলে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে নাটকটি। খোরাক জুগিয়েছে ভাবনার।

জলপাইগুড়ি কলাকুশলী প্রত্যেক বছর এই সময় নাট্য উৎসব করে থাকেন। এবার হেমন্তের পড়ন্ত সন্ধ্যায় তাঁরা আয়োজন করেছিলেন তিন দিনের নাটকের উৎসবের। প্রথমদিন কোচবিহার ব্রাত্যসেনা প্রযোজনা করলেন কানাই কুন্ডুর গল্প অবলম্বনে নাটক 'দুধমা'। তমোজিৎ রায়ের নির্দেশনায় খুব ভাল একটি নাটক দেখা গেল। সেদিনই বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনা প্রযোজিত 'অপরাজিতা' নামে একটি নাটক অভিনীত হল যা দর্শকদের তুমুল প্রশংসা কুড়োয়। দ্বিতীয়দিন ব্যান্ডেল আরোহী নিবেদন করলেন 'হলুদ রঙের টি-শার্ট'। নির্দেশক ও অভিনেতা রঞ্জন রায় চমৎকার অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করলেন। সেদিন 'কালো জলের মাছ' নামে একটি নাটক প্রযোজনা করলেন কলকাতার বিদূষক নাটকের দল। অন্যরকম ভাবনা। ভাল লাগল। শেষদিন ছিল একটিই নাটক। কলকাতা হ-য-ব-র-ল প্রযোজিত 'বিপজ্জনক', যার ট্যাগলাইনে বলা ছিল 'শাসকের চোখে, সমাজের চোখে এবং আত্মজনের বিচারে এক দেশদ্রোহীর আখ্যান'। নাটকটি লিখেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন চন্দন সেন। নাটকের মূল চরিত্রে ছিলেন বাংলা নাটকে ক্রমশ মিথ হতে চলা দেবশংকর হালদার। মঞ্চসজ্জা করেছেন হিরণ মিত্র। স্টার ভ্যালুর নিয়ম মেনে সেদিনই সবচাইতে বেশি দর্শক এসেছিলেন প্রেক্ষাগৃহে। শ্রীজাতা ভট্টাচার্য, সুভাষ মৈত্র, সুমন সিংহ রায়ের মতো অভিনেতারা যথাযথ অভিনয় করলেন। আলোর পরিকল্পনা, মঞ্চসজ্জা বা রূপসজ্জা যথাযথ। কিন্তু কোথাও গিয়ে নাটকের বিষয়ভাবনা আমাদের খুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিতে পারল না। দেবশংকরের মতো কিংবদন্তি অভিনেতা থাকা সত্ত্বেও নাটকটি সাধারণত্বের সীমা ছাড়িয়ে অসাধারণত্বের দিকে উড়ান দিতে পারল না।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

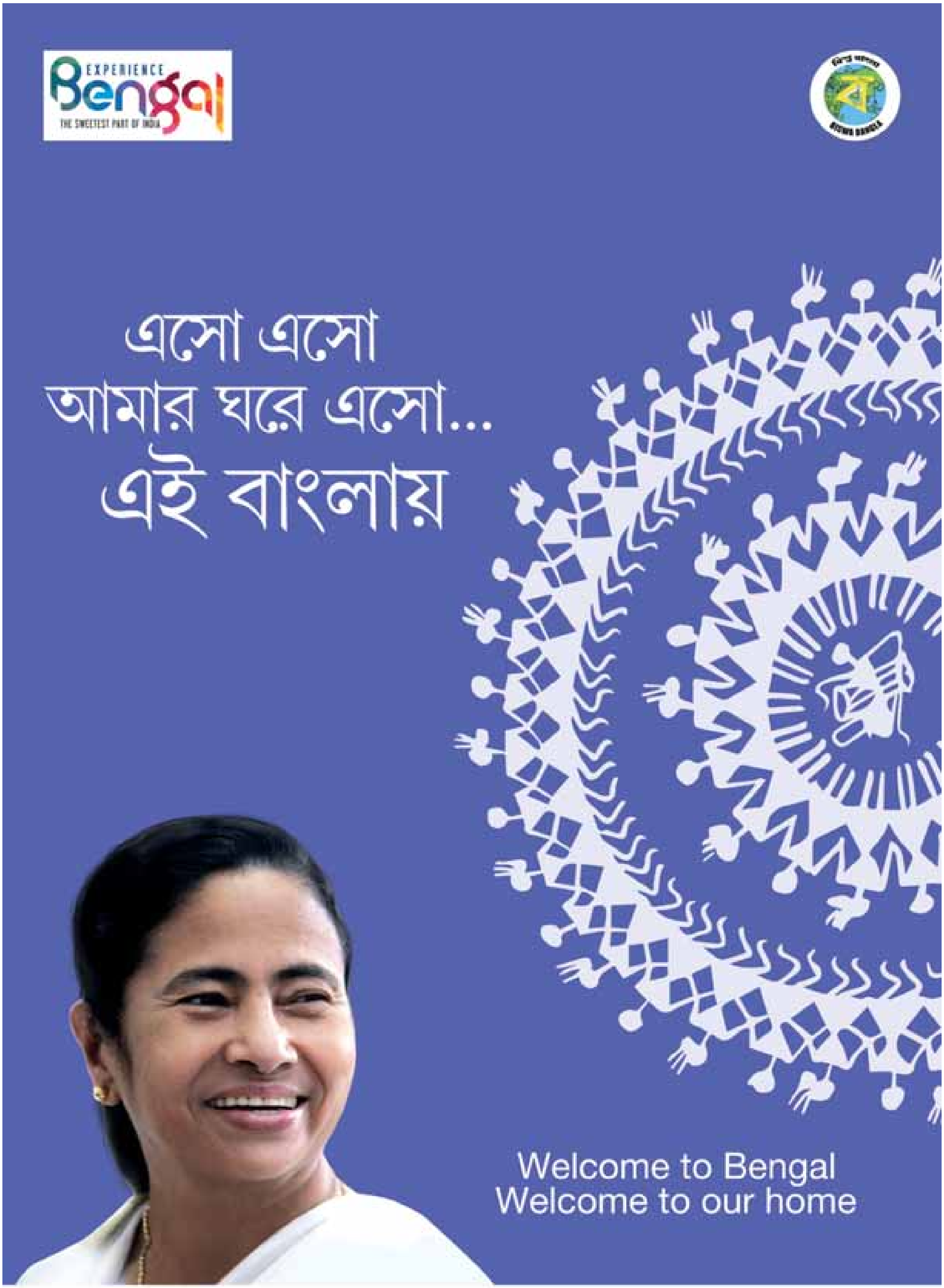

WEST BENGAL TOURISM
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন চোখে বাংলা

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-14 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৭। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

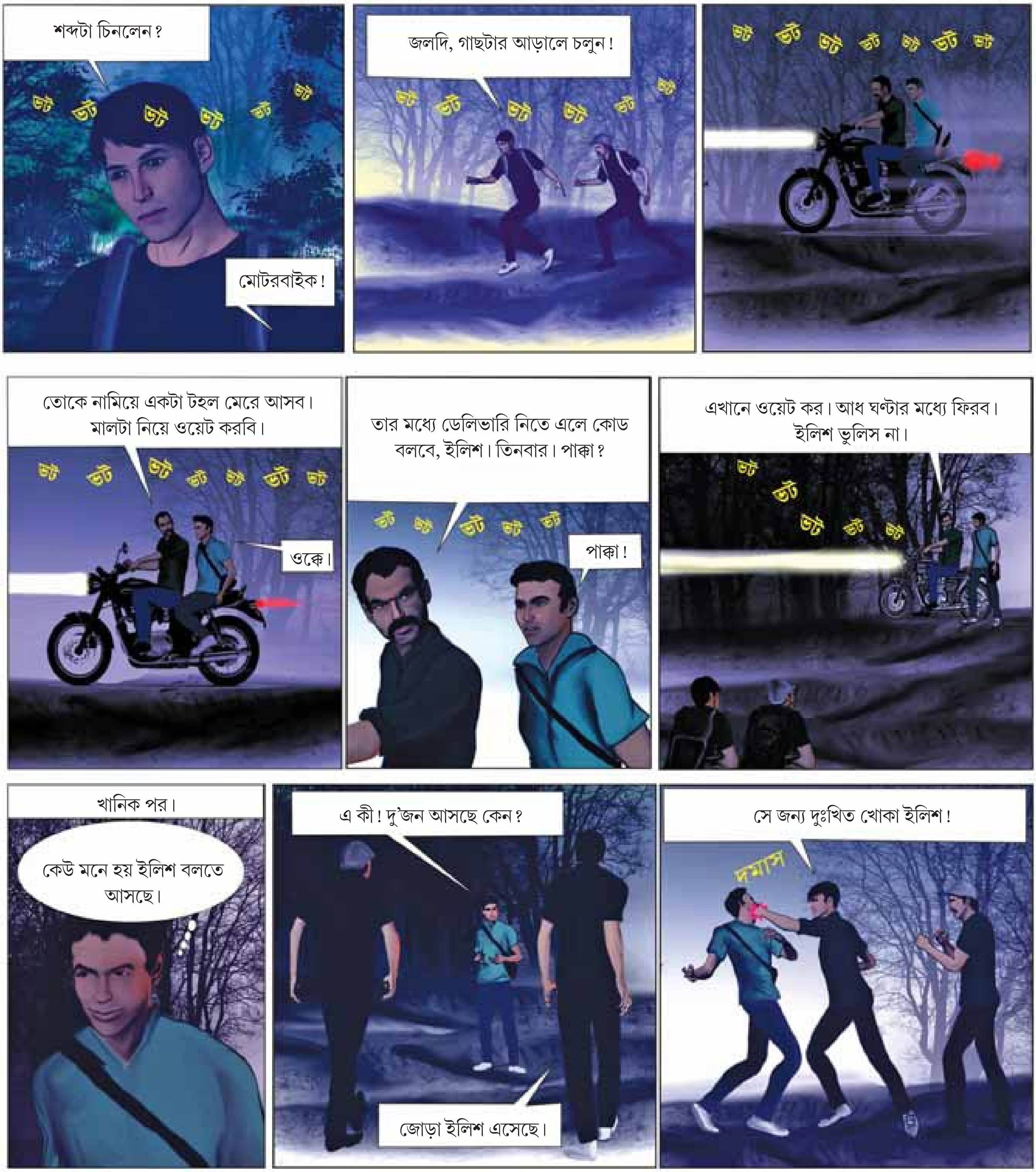

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.